

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

(জীবনী ও উপদেশ)



হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক পরিব্রাজক

শ্রী সত্যচরণ মিত্র

প্রণীত।





কলিকাতা

৩১নং গুলু ওস্তাগরের লেন, গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসে,

শ্রী প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত।



সন ১৩০৪ সাল।

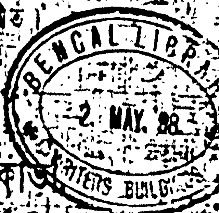
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

(জীবনী ও উপদেশ।)

হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক পরিব্রাজক

শ্রীসত্যচরণ মিত্র

প্রণীত।



কলিকাতা

৬৮ নং শুড় ওস্তাগরের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে,

শ্রী প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা

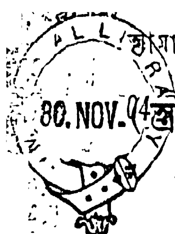
মুদ্রিত।

১৩১২ সাল

মূল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায় নিজ পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—

We have very great pleasure in introducing and recommending to our readers Babu Satya charan Mitra. He is a Bengali writer of supereor telents and great originality and his two books Bora bau and Abalabala were highly spoken of by the public and the press and carried off the palm of pre-eminence in the Bengal Government's report of the progress of Bengali Literature &c. (1892—Hope).



তাঁহার পুস্তক সম্বন্ধে মত :—

(স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস।)

অবলাবালা ——১৷৷০

১৮৮৭ সালে বঙ্কিমবাবুর সীতারাম, রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি, স্বর্ণলতা প্রণেতা হরিষে বিষাদ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার শক্তি কানন প্রভৃতি সুগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ; গবর্ণমেণ্টের আদি রিপোর্টে অবলাবালা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম প্রশংসিত হইয়াছে :—

And the best of these, is "Abala bala" by Babu Satya charan Mitra. The characters in this book are boldly and distinctly drawn and they are real because the author is in Sympathy with them. &c.

(India Government—Home department)

(গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট ১৮৮৭



ভূমিকা।

—:(০):—

হিন্দুধর্ম্ম প্রচারোপলক্ষে ঢাকা নগরে অবস্থিতিকালে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা লেখক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সহিত বিশেষ আলাপ হয়। ইনি আমাকে "রামকৃষ্ণ পরমহংসের" সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী লিখিবার জন্য পরামর্শ ও উৎসাহ দান করেন। আমি তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া "রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী" লিখিতে প্রতিজ্ঞা করি। বাঙ্গালার বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের অনেক ভদ্রলোক পূর্ব্বপ্রকাশিত "রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন-চরিত" মধ্যে অনেক হাস্যোদ্দীপক কথা পাঠ করিয়া দুঃখিত হয়েন এবং আমার বক্তৃতায় রামকৃষ্ণ জীবনের অনেক অতি চমৎকার নূতন কথা শুনিয়া বিমোহিত হয়েন এবং আমাকে পরমহংসের একখানি প্রকৃত জীবনী লিখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন—তাহাতে আমি স্বীকৃত হই। রামকৃষ্ণের পূর্ব্ব জীবন-চরিত লেখকেরা লিখিয়াছেন রামকৃষ্ণের লেজ বাহির হইয়াছিল, মাসে মাসে ঋতু হইত (রাধাভাবে সাধনার সময়), জন্মের সময় পিতা বিদেশে ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল কথা পড়িয়া লোকে ভক্তি শিখিবে, না দুর্নীতি শিখিবে, না হাঁসিবে রামকৃষ্ণের ভক্ত জীবন-চরিত লেখকেরাই তাহা জানেন। যেমন দশচক্রে ভগবান ভূত হন সেইরূপ ভক্তচক্রে পড়িয়া অনেক মহাপুরুষ

সময়ে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবে সত্ত্ব ভাব যে পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল এমন বুঝি আর দেখা যায় না।* রামকৃষ্ণ পরমহংসে সত্ত্বভাব প্রকাশ পাইয়া সমুদয় জগতে বিপ্লব আনিবার যোগাড় করিতেছে। এই সূক্ষ্ম ক্রিয়াটী আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

বুদ্ধদেবের পর ভারতে অনেক মহাত্মা প্রকাশিত হন। জ্ঞানের অবতার শঙ্কর, ও প্রেমের অবতার চৈতন্য ও নানক বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ হইয়া তৎসময়ের মন্দীভূত ধর্ম্ম স্রোতকে প্রবল বন্যায় মহা তেজস্বী করিয়া মুক্তির পথকে সুগম করিয়া যান। এই কয় মহাত্মার জীবন-সম্ভূত প্রকাণ্ড জ্ঞান ও ভক্তির স্রোতে ভারতবর্ষ সুস্নিগ্ধ ভাব ধারণ করে। সেই নদীর তটে বসিয়া কবির, দাদু, রূপ, সনাতন, হরিদাস, প্রভৃতি কত মহাত্মা শিষ্য মণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া বিভুগুণ কীর্ত্তনে মানুষের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছিলেন। কালক্রমে হিন্দুর মনোভূমি–প্রবাহিত জ্ঞান ও ভক্তির নদী শুকাইয়া আসিল; বিভুগুণকীর্ত্তন ষড়রিপুর ব্যাঘ্র-নাদে আচ্ছন্ন হইল; মানুষ ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় আপন আপন বল বীর্য্যকে আহুতি দিল; ভগবানের পূজা আরাধনা সমস্তই বাহ্যাড়ম্বরে থাকিয়া গেল। এইরূপ সময়ে ভগবানের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। মৃত জাতির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হইল। ভগবানের ইচ্ছায়,

---

* ঢাকার নিকট বারুদিনামক গ্রামে যে পরমহংস ছিলেন (বারুদির ব্রহ্মচারি নামে বিখ্যাত) তিনি রামকৃষ্ণের সমকক্ষ। রামকৃষ্ণ প্রেম মার্গের এবং ইনি চিৎমার্গের সাধক।

ভারতের সৌভাগ্য বশতঃ, ঠিক এমনি সময়ে, বঙ্গদেশে এক অসামান্য পুরুষ, আকাশে ভগবানের অক্ষয় নামের নিশান তুলিলেন। বঙ্গদেশে ব্রহ্ম নামের ধ্বনি উঠিল—বেদ বেদান্তের আলোচনা আরম্ভ হইল—ধর্ম্মের আন্দোলন উপস্থিত হইল। সমুদয় সভ্য জগতে সেই আন্দোলনের ধাক্কা লাগিল। রাজা রামমোহন রায় বেদবেদান্তপ্রতিপাদ্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রচারিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের ভুবন বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করিলেন। সে পতাকা দেখিয়া খৃষ্টানদের ভয় হইল, মুসলমানদের আশঙ্কা হইল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম আনন্দে হুঙ্কার দিতে লাগিলেন; দেবতারা আকাশ হইতে রামমোহনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হিন্দু সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বনে জঙ্গলে পর্ব্বত গুহায় বাস করিতেছিলেন। ভগবান জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এই মহাজ্ঞানের কথা সমাজের কেহ বলিত না। ব্রহ্মজ্ঞানের সিংহাসনে দেবতাজ্ঞান উপবিষ্ট হইয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। যে ব্রহ্মজ্ঞান-সাগরের বারি স্পর্শ করিবামাত্র শুকদেব আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিয়াছিলেন; যে ব্রহ্মজ্ঞান-সাগর দর্শন করিবামাত্র নারদ আনন্দে অধীর হইয়া বীণাযন্ত্রে বিভুগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন; যাহা পাইলে মানুষ আর পাথরে পাথর দেখে না, পর্ব্বতে আর পর্ব্বত দেখে না; মানুষে মানুষ দেখে না, এই সমস্ত জগতে কেবল চৈতন্যই দর্শন করে; সেই মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞানের বার্ত্তা যেন ভারতবর্ষ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় সেই লুপ্ত জ্ঞান রত্নের উদ্ধার কর্ত্তা। রাজা রামমোহন রায় হইতে সেই

দিন অবধি ভারতে এক নব যুগের আরম্ভ হইল। রাজা রাম-মোহন রায় ভারতের ভাবী ধর্ম্ম-বৃক্ষের বীজ-রোপক।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পাবনীশক্তি যখন কমিয়া গেল। জ্ঞান-প্রধান ধর্ম্ম যখন শুষ্ক-তর্ক ও শুষ্ক মতে পরিণত হইল, ভারত-বাসীর হৃদয় মন যখন এক প্রকার নাস্তিকতায় আচ্ছন্ন হইল; এমন সময়ে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য "চিদানন্দরূপোশিবোহং" জ্ঞানের জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া, নাস্তিক ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ আস্তিকতায় আচ্ছন্ন করিলেন। বাস্তবিক পৃথিবীর ধর্ম্মইতিহাসে এরূপ প্রতিক্রিয়ার বিবরণ আর পাওয়া যায় না। ওরূপ ভীষণ শুষ্ক নিরীশ্বর-বাদী কর্ম্ম-প্রধান জাতির মধ্যে এরূপ তীব্র ব্রহ্মবাদ ও তীব্র বৈরাগ্য প্রচলন জগতের ইতিহাসে দেখা যায় না। ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা। জগৎ যখন স্বপ্নবৎ মিথ্যা; তখন জগতের কর্ম্মকাণ্ডও মিথ্যা। সমস্ত পরিহার করিয়া সেই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য চেষ্টিত হও। এজন্য শাস্ত্র পাঠ কর, বিচার কর, আলো-চনা কর, ধ্যান ধারণা কর। শাস্ত্রপাঠ, বিচার, ধ্যান, ধারণা ব্যতীত আর সমুদয় অগ্রাহ্য। শঙ্করের এই তীব্র ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির জ্ঞানী মাত্রেই তাঁহার শিষ্য হইল। যে শঙ্করের উপদেশ পাইল, বা শঙ্করের নিকট বিচারে পরাস্ত হইল, সেই শঙ্করের প্রদর্শিত "সন্ন্যাস" অবলম্বন করিল। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে সন্ন্যাসীর সংখ্যা বড়ই বাড়িয়া গেল। কত শত ব্রাহ্মণ যুবক পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিল; কত শত যুবা আদরের স্ত্রীরত্নকে বক্ষ হইতে দূরে ফেলিয়া গহন বনে তপস্যার জন্য ছুটিল। ব্রহ্মলোভে আকুল হইয়া আলুলায়িতকেশা প্রেমপাগলিনী প্রণয়িনীর আকাশভেদী

ক্রন্দন একটীবারও ফিরিয়া শুনিল না,—তীব্র বৈরাগ্যে অধীর হইয়া ভবপাশ ছেদনের জন্য গহন বনে ছুটিল।* জ্ঞান ও বৈরাগ্য যতদূর ফুটিতে পারে শঙ্করের যত্নে ভারতবর্ষে ফুটিয়াছিল। কিন্তু কালের নিয়মে তাহাও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। মানুষের প্রকৃতি ভীষণ হইয়া উঠিল। এমনি সময়ে ভক্ত সম্রাট শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ পাইল। প্রকৃত জ্ঞান প্রকৃত ভক্তি এত দিন অপরিস্ফুতভাবে প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগে শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি যে এক পদার্থ তাহা জীবনে কেহ দেখাইতে পারেন নাই। চৈতন্য দেবের পূর্ব্বে জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া একটা বড়ই মারামারি কাটাকাটি চলিতেছিল। চৈতন্য আপন জীবনে সেই বিবাদের মীমাংসা করিলেন। শ্রীচৈতন্য দেখাইলেন শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তিতে কোন প্রভেদ নাই। সচ্চিদানন্দ সাগরে যখন ভগবানকে লাভ করা যায় তখন মানুষের জ্ঞানশুদ্ধি হয়—আর সেই যে জ্ঞানের পরিশুদ্ধি তাহাই পরাভক্তিতে পরিণত হয়। জ্ঞান পাকিয়া যখন টুসটুসে হয় তখন তাহা শুদ্ধাভক্তি। ভক্তির প্রগাঢ়তাই ঈশ্বর প্রেম। এই প্রেম ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকাশ শ্রীচৈতন্যে হইয়াছিল। এরূপ আর কোন দেশে কোন মানুষে হয় নাই। যদি প্রেমের অবতার কাহাকেও বলিতে হয় তো তিনি শ্রীচৈতন্য। যদি প্রেমের বিকাশ কোন জাতির মধ্যে হইয়া

---

* শঙ্কর স্বজাতির মধ্যেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্যের মত সর্ব্বজাতির মধ্যে করিলে ভারতের সর্ব্বনাশ হইত। অধিকাংশ লোক সন্ন্যাসী হইলে সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইত।

থাকে তো সে বাঙ্গালী জাতি। যদি প্রেমভক্তির পিঠাস্থান পৃথিবীর কোথাও থাকে তো সে বঙ্গদেশ। যদি প্রেমভক্তি প্রকৃত বর্ণনা কোন সাহিত্যে থাকে তো বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যে আছে। ধর্ম্মের যাহা শেষ—মহত্ত্বের যাহা চরম তাহা শ্রীচৈতন্য স্বয়ং। ধর্ম্ম শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা আর কোথাও ফুটে নাই। এই জন্য আমাদের শ্রীচৈতন্য জগতের চৈতন্য। এমন দিন আসিবে যখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি এই মহাপুরুষকে প্রেমের আগার বলিয়া পূজা করিবে। বুদ্ধ বল, মহম্মদ বল, খ্রীষ্ট বল, ঐতিহাসিক যুগের কেহই চৈতন্যের সমান নহেন। ধন্য বাঙ্গালী জাতি। ধন্য বাঙ্গালা ভাষা।

কিন্তু কালের এমনি মহিমা! কলিতে এমনি প্রভাব যে অমন মাখনের ন্যায় কোমল প্রেমধর্ম্ম আজ দুশ্চরিত্রের হাতে পড়িয়া পচিয়া উঠিয়াছে। ভাল বস্তু পচিলে তার সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্ম্ম যখন বিকৃত হইয়া মনুষ্যের অব্যবহার্য্য হইল। এ দেশে ধর্ম্মের সার ত্যাগ করিয়া কিছুকাল খোসা লইয়া থাকিল। খ্রীষ্টানদের আক্রমণে হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার যোগাড় হইল, এমনি সময়ে রাজা রামমোহন রায় বলিলেন "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ"। "নিরাকার ব্রহ্মের পূজা প্রেমভক্তি দ্বারা করিতে হয়"। "ব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ"। "অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অবতার হয় না"। "রামকৃষ্ণ ইঁহারা মানুষ"।

এই সব কথার তেজে ভারবর্ষের সাময়িক উপকার হইল। কারণ এই সময়ে শ্রীরাম পুরে কেরি মার্শম্যান প্রভৃতি খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক-গণ ইংরাজী শিক্ষিতদের মন হইতে হিন্দুভাবকে বিনষ্ট

করিতেছিলেন। কেহ কেহ খ্রীষ্টান হইতে থাকিল। বাকি কেহ কেহ নাস্তিক হইয়া অখাদ্য ভোজনে মানবত্ব বজায় জ্ঞান করিল। রাজা রাম মোহন রায়ের প্রচারে ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হইল। হিন্দুধর্ম্ম কতকটা, নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে ঢলিয়া পড়িল; সাকার উপাসনার উপর অনেক ইংরাজি শিক্ষিতের বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল। এই সময়ে কোন কোন ইংরাজি শিক্ষিত যুবা * শাল গ্রাম শিলায় মাছ ধরিবার পিটুলি বাটিতেন এবং এরূপ কর্ম্মকে বারত্ব বলিয়া মনে করিতেন। রাজা রাম মোহন রায় বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লইয়া " ব্রহ্মসভা " প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু রাম মোহনের সেই হিন্দু-ব্রহ্ম-জ্ঞান ব্রাহ্মসমাজে গৈরিকবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যখন হ্যাট্ কোট পরিয়া চশমা চোখে নিলেন ও দাড়ি রাখিয়া চাচা সাজিলেন তখন হিন্দুধর্ম্মের বড় ভয় হইল। তখন হিন্দু ধর্ম্ম যেন বলিলেন " Save me from my friends " সেই চশমা দাড়ি ও হ্যাট কোট ধারী নবব্রাহ্মধর্ম্ম শঙ্করের সিংহাসনে থিয়োডোর পার্কারকে উপবেশন করাইয়া বেদীর উপর হইতে গ্যাসের আলোকে বলিতে লাগিলেন "তোমরা পুতুল পূজা করিও না †"। তোমরা

---

* যুবার দলই অধিক। বুড়া বয়সে সকলেই হরিনামের মালা লইতেন।

† রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন "সাকার উপাসনা নিকৃষ্ট সাধনা—অজ্ঞের জন্য" কিন্তু কেশব চালিত ব্রাহ্মেরা কহিলেন " Idolatry is sin " সাকার উপাসনা পাপ।

বাপমার শ্রাদ্ধ করিওনা"। "তোমারা বিধবা বিবাহ দাও"। "তোমরা অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া কুলবিহঙ্গিনীদিগকে স্বাধীনতার আকাশে উড়াইয়া দাও" এইরূপ এক একটা বিকট কথা শুনিতে শুনিতে লোকের ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিল। ব্রাহ্মদলের উপর লোকের অশ্রদ্ধা হইল। ঈশ্বর পিপাসু অনেক ব্যক্তি ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ব্যথিত প্রাণে আপনাদের প্রাচীন শাস্ত্র খুলিলেন; কিন্তু শাস্ত্রের নানা রূপ ব্যাখ্যা নানারূপ টীকা দেখিয়া পুঁথি মুড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, পুথিগত মৃতশাস্ত্রে কি জীবনের পিপাসা মিটে? ম্যাপের নদীতে কি তৃষ্ণা নিবারিত হয়? পাঁজিতে লেখা আছে? আড়া জল; কিন্তু পাঁজি নিঙড়াইলে এক ফোটা জল পড়েনা।

হিন্দুদের মধ্যে অনেক ইংরাজী শিক্ষিত লোকে ঈশ্বর পিপাসু হইলেন। কতক কতক লোক নিজ নিজ সমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্ম দল ভুক্ত হইলেন। আর কতকগুলি তাহা না করিয়া প্রকৃত সাধুর অন্বেষণে থাকিলেন। ভস্মলেপিত জটাজুটধারী কত সন্ন্যাসী সাধু দেখা গেল; কিন্তু পাপজীবনকে বদলাইয়া জগাই মাধাইএর ন্যায় উদ্ধার করিতে পারে এমন লোক খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যদিও দুই একটী ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ন্যায় পাওয়া গেল তাঁহারা মানুষ ভাল বাসেননা অর্থাৎ প্রেমবিহীন সংসার বিরাগী যোগী। ইহাঁদের কাছে বৎসরাবধি বসিয়া থাকা যা আর প্রস্তরের দেব মূর্ত্তির নিকট বসিয়া থাকাও তা। অনেক সাধুর অন্বেষণ করা গেল, অনেক আচার্য্যের অন্বেষণ করা গেল, অনেক আদর্শ পুরুষের অন্বেষণ করা গেল; কিন্তু ১৬ আনা সাধুতা-

কোথাও পাওয়া গেলনা। কোথাও দুআনা, কোথাও চারি আনা, কোথাও দশ আনা। একটু না একটু কৃত্রিমতা আছেই আছে—ভেলশূন্য খাঁটিমানুষ পাওয়া গেলনা। কেহ কেহ অদ্বৈতের ন্যায় আকাশের দিকে সজল নেত্রে কাঁদিলেন "ভগবান! কে ধর্ম্ম শিখাইবে? শাস্ত্র যে বুঝিনা ঠাকুর! তুমি আমাদের কৃপাকর-হে অনাথের নাথ! আমরা আচার্য্যহীন অনাথ—আমাদের আচার্য্য দাও!"

কয়েক জন ভক্ত যখন এইরূপ দিন রাত্রি কাঁদিতে লাগিলেন; গঙ্গাতীরে বসিয়া,পথে বেড়াইতে বেড়াইতে,বিছানায় মুখ গুজিয়া পাগলের ন্যায় যখন ঐরূপ প্রাণের ভাষায় কাঁদিতে লাগিলেন, তখন ভগবান আর থাকিতে পারিলেন না। ভগবান ভারত বর্ষের পরিত্রাণের জন্য "রাম কৃষ্ণরূপী" হইয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে প্রকৃত জ্ঞান ভক্তির আধার রূপে প্রকাশিত হইলেন।

পৃথিবীর ধর্ম্মেতিহাসে "রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন" এক অত্যদ্ভুত সামগ্রী। এরূপ ব্যাপার বুঝি বা আর কখনও হয়নাই। কই ইতিহাসে তো পাওয়া যায়না। রামকৃষ্ণ একটী বিষয়ে অদ্বিতীয়। সেটী তার সর্ব্বধর্ম্ম-ভাব সমন্বয়ী জীবন। নানক কবীর, বুদ্ধ, খ্রীষ্ঠ, মহম্মদ প্রভৃতি জগতের মহাজনেরা এক একটী বিশেষ ভাবে সিদ্ধ। ইহাঁরা প্রত্যেকে জগতের একটী বিশেষ ভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মানব মনের একএকটী বিশেষ ভাবকে বলবান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্রের সমস্ত সাত্বিক ভাবের একাধারে প্রকাশ কখনও হয় নাই। গোলাপ ফুলের গাছে গোলাপ ফুল ফোটে, পদ্ম গাছে পদ্ম ফোটে দেখিতে

বড়ই সুন্দর। কিন্তু একগাছে সব ফুটিলে কেমন শোভা হয়, বল দেখি? আমাদের রামকৃষ্ণ বৃক্ষে বৈকুণ্ঠ ও কৈলাসের সমস্ত ফুল ফুটিয়াছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাধনাবৃক্ষের কোন ডালে বেদ ফুল ফুটিয়া বেদ-প্রাণ হিন্দুর মন প্রাণ হরণ করিয়াছে, কোন ডালে বেদাতীত প্রেম-ধর্ম্ম ফুল ফুটিয়া বৈষ্ণবদিগের নয়নে অশ্রু আনয়ন করিয়াছে, কোন ডালে বাইবেল ফুল সুগন্ধবিস্তারে দূর হইতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছে, কোন ডালে কোরাণ ফুল ফুটিয়া তীব্রগন্ধে মুসলমানের প্রাণে মাদকতার সঞ্চার করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মুখ-কমল নিপতিত গীতা শাস্ত্রে সর্ব্বধর্ম্মবীজ নিহিত আছে। কিন্তু সে সমস্ত অতি সূক্ষ্ম বীজাকারে। সেই বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়া পুষ্প ফল ভরে পৃথিবীর কল্যাণ সাধন করিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি কস্মিন কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানিনা। অমন যে শঙ্কর সে শঙ্করের জ্ঞান, অমন যে চৈতন্য সে চৈতন্যের ভক্তি, রাম কৃষ্ণ প্রকৃতিতে ফুটিয়াছিল। রাম কৃষ্ণ আপন প্রকৃতির প্রস্ফুটনের জন্য কোন টোলে কি স্কুলে কি কলেজে যান নাই। পুস্তক পাঠে তিনি কোন শিক্ষালাভ করেন নাই। মাথার উপরে নক্ষত্রমালা বিভূষিত যে আকাশ, চতুঃপার্শ্বে যে শ্যামলা প্রকৃতি, পদতলে যে সর্ব্বসহা বসুন্ধরা, ইহাঁরাই রাম কৃষ্ণের পুস্তক ছিল, এবং আপনার জীবনের ভিতর যিনি অন্তর্য্যামী ভগবান তিনিই রাম কৃষ্ণের মহা শিক্ষক:—

If your eye is on the eternal, your intellect will grow, and your opinions and actions will have a

beauty which no learning or combined advantages of other men can rival—Emerson,

পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম্মের মত উদার ধর্ম্ম নাই। ইহা ভগবানের মুখকমল নিঃসৃত মধু, রামকৃষ্ণ সেই উদার হিন্দুধর্ম্মের সকল ভাবের অভিব্যক্তি।

এখন ভারতবর্ষে সকল জাতীয় লোকের সংমিশ্রণ। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সমাগম। এখন হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম-শাস্ত্র পড়ে, মুসলমান হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ে, মুসলমান খৃষ্টানের কাছে উপদেশ চায় খৃষ্টান মুসলমানের কাছে উপদেশ চায়। এরূপ সর্ব্ববর্ণ সংমিশ্রণের যুগে এই যুগোপযুক্ত একটী ধর্ম্মের প্রয়োজন। এখন আর হিন্দু মুসলমানকে কি মুসলমান খৃষ্টানকে ঘৃণা করিলে চলে না। এখন এক স্কুলে এক অফিসে এক গাড়িতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান একত্রে অবস্থান করিতেছে। এরূপ সময়ের উপযুক্ত ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য একজন আদর্শ আচার্য্যের প্রয়োজন। যখন যাহা দরকার ভগবান দেন। বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসকে প্রেরণ করিলেন। ইনি মুসলমানকে শিবনাম দিলেন খৃষ্টানকে কালী নাম দিলেন; হিন্দুকে কালীদুর্গা কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম ছাড়া আল্লা নামও দিলেন। এইটী নূতন এবং সময়োপযোগী। ইহাঁর ভাবে জগতের সমস্ত ধর্ম্ম শক্তি-শালী হইবেক। কোন ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে না। মুসলমান মুসলমান থাকিবে অথচ হিন্দু ধর্ম্মের অনেক ভাব গ্রহণ করিবে। হিন্দু হিন্দু থাকিবে অথচ মুসলমান ও খৃষ্টানের বিশেষ ধর্ম্মভাব গ্রহণ

করিবে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের একটী কেন্দ্র আছে। রামকৃষ্ণ সেই কেন্দ্রের উপরে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়কে বলিতেছেন "তোমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যা বিশ্বাস পাইয়াছ, দৃঢ়রূপে তাহা ধরিয়া, সরল প্রাণে ভগবানকে ডাক তিনি সাড়া দেবেন।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।



হুগলি জেলার মধ্যে জাহানাবাদের নিকটে কামার পুকুর গ্রাম। এই গ্রামে ১৭৫৬ শকাব্দের ১০ই ফাল্গুন, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হয়েন।

জাহানাবাদের সন্নিকটস্থ স্থানের জল-বায়ুতে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বর্দ্ধিত হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ভুবনবিখ্যাত রাজা রামমোহন রায়, দয়ার সাগর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ধর্ম্মপ্রাণ রামেশ্বর (সত্য নারায়ণের কাব্যরচয়িতা) এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। যে অঞ্চলের মৃত্তিকা এবং জল-বায়ু হইতে মানবমনের এত দূর উন্নতি হইতে পারে; বাঙ্গালীমাত্রেরই সে স্থল একবার দর্শন করা কর্ত্তব্য।

রামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় যেমনি ধার্ম্মিক ছিলেন; জননী ও তদনুরূপ সাধ্বী ও দয়াবতী ছিলেন। ক্ষুদিরাম যখন ইষ্ট দেবতার পূজায় বসিতেন তখন এক আশ্চর্য্য শোভা ফুটিয়া পড়িত। রঘুজী মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া ক্ষুদিরাম যখন মন্ত্রপাঠ করিতেন তখন পূজার ভক্তি, প্রেমে পাথরে চৈতন্যের সঞ্চার হইত;—ঘরের ভিতর যেন গম গম করিত;—যেন রঘুজী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেন।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে দূর হইতে দেখিবামাত্র লোকের ভক্তি হইত। কেহ ক্ষুদিরামের সম্মুখ দিয়া যাইতে সাহস

পাইতনা। ক্ষুদিরাম যখন পুকুরের জলে আহ্নিক করিতেন তখন সে জলে নামিতে কাহারও সাহস হইতনা।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় বড় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ঋণকে বড় ভয় করিতেন। লোককে যাহা দিতেন একবারেই "দান" মনে করিয়া দিতেন। জিনিস বন্ধক দিতেন না—জিনিস বিক্রয় করিতেন। সুদে মানুষের ঋণ ভয়ানক বাড়ে—এটা তিনি ভালরূপ বুঝিতেন। ক্ষুদিরামের অনেক গুণের কথা আছে। বাজারে একদরে জিনিস কিনিতেন*। ক্ষুদিরাম হাটে কলা কিনিতেছেন:—"কলা পয়সায় কটা হে"? "৯টা মহাশয়"। ক্ষুদিরাম বিক্রেতাকে পয়সাটী দিলেন। কলা বিক্রেতা ১০টী কলা দিল। ক্ষুদিরাম একটী ফেরত দিয়া একটু রুক্ষ স্বরে কহিলেন "এখনও দিন রাত হয় বাপু! মিথ্যা কথায় লাভ কি?

একদিন ক্ষুদিরাম জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের সহিত অতি ভোরে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ৬।৭ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পর ক্ষুদিরামের মনে পড়িল "অমুক ব্যক্তিকে আজ টাকা দিবার কথা আছে"। সর্ব্বনাশ! ক্ষুদিরামের ন্যায়পরায়ণ জীবন চমকিত হইল। ক্ষুদিরাম ম্লানমূর্ত্তিতে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বাবা রামকুমার! বাড়ি ফিরিতে হইল; আজ আর যাওয়া হইল না—অমুককে টাকা দিবার কথা আছে। সে টাকার জন্য আসিয়া ফিরিয়া যাবে। বাবা! ফিরিয়া যাই চল।" ন্যায়পরায়ণ পিতার স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া পুত্র স্তম্ভিত হইলেন—

---

* বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রকৃতি এইরূপ।

ন্যায় পরায়ণতা পুত্রের চরিত্রের হাড়ে হাড়ে প্রবিষ্ট হইল। পাঠক পাঠিকা! দেখিলেন রামকৃষ্ণের কেমন পিতা। আবার রামকৃষ্ণের মা কেমন দেখুন:—

রামকৃষ্ণের দয়াবতী জননী বাটীর কাছে কোন গরিবের দুঃখের কথা শুনিলে কাঁদিয়া ফেলিতেন। খাবার সময়, কোন ভিখারী আসিয়া ভাত চাহিলে, আপনার ভাতের থালা ধরিয়া দিতেন। তাঁর আপন পর ভাব ছিলনা। আপনার ছেলেদের মতনই পরের ছেলেদের দেখিতেন। এক সময়ে ৺পূজার সময়ে, রামকৃষ্ণ পূজার কাপড় পরিয়া আনন্দ- মূর্ত্তির ন্যায় উঠানে খেলা করিতেছিলেন, এমন সময়ে রামকৃষ্ণের খেলুড়ে একটী বালক একখানি ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়া রামকৃষ্ণের কাছে আসিল। রামকৃষ্ণের কাপড়ের খুঁট ধরিয়া "ভাল কাপড়" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এই দৃশ্য দেখিয়া রামকৃষ্ণের জননী কাঁদিয়া ফেলিলেন—অশ্রুপূর্ণনয়নে জননী পুত্রকে বলিলেন "বাবা রাম! তোমারতো কাপড় পরা হয়েছে, এখন ও কাপড় খানি ওকে দাও, তোমায় আর এক খানা কাপড় দেব"। কোমলস্বরে এই কথা মার মুখ হইতে শুনিবামাত্র বালক রামকৃষ্ণ বিরুক্তি না করিয়া হাসিতে হাসিতে কাপড় খুলিয়া দিল।

রামকৃষ্ণের ডাকনাম ছিল গদাই। কথিত আছে রাম কৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে, ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়া থাকিবার সময় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; "গদাধর আসিয়া বলিতেছেন, আমি তোর পুত্র রূপে জন্মিব"। এই ঘটনার পর রামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হয়েন। গদাধরের নামানুসারে রামকৃষ্ণকে "গদাই" বলিয়া

ডাকা হইত।

গদাই বড় সুন্দর ছেলে। যে দেখে সে সেই কোমল নধর মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। দেখিলেই স্ত্রীলোকদের একবার কোলে করিবার সাধ হয়। বর্ষিয়সীরা সেই মূর্ত্তি কোলে করিয়া ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিবার সময় অপত্যস্নেহে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। গদাইকে অনেকে আপন বাটিতে লইয়া গিয়া খাবার খাইতে দিত। গদাই জাতি-ভেদ না মানিয়া খাইতেন। অনেক পুত্রাকাঙ্ক্ষিনী মনে মনে ভাবিতেন "ছেলে হয়তো এই রকম"।

গদাইএর লেখা পড়ায় আদতে যত্ন ছিলনা। যত্ন ছিল যাত্রা শুনিতে, শুনিয়া তদ্রূপ নকল করিতে। আরো অধিক যত্ন ছিল দুর্গা, কালী প্রভৃতি ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতে, এবং সময় বিশেষে শিব, কৃষ্ণ সাজিয়া গৃহস্থদের অন্দরে প্রবেশিয়া স্ত্রীলোকদিগের, নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে। গদাই যাত্রা, পাঁচালী, কবি শুনিয়া সমুদয় কৃষ্ণ ও রামলীলা মুখস্থ করিয়াছিল। কথন কখন খেলুড়েদের সঙ্গে মাঠে গিয়া যাত্রার নকল করিতেন। নিজে কৃষ্ণ সাজিতেন, অপরদিগকে শ্রীদাম, সুবল সাজাইতেন; নিজে রাম সাজিতেন, অপরদিগকে রাবণ, হনুমান প্রভৃতি সাজাইতেন। কৃষকেরা দূর হইতে সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আপনাদের ক্ষেত্রকর্ম্ম ভুলিয়া যাইত।



অলৌকিক দর্শন।*



বয়স তখন ৯ বৎসর। ইদের দিন। কামারপুকুরের নিকটস্থ মাঠে রামকৃষ্ণ মুসলমানদের ইদ দেখিতে যাইতেছিলেন। একলা যাইতে যাইতে একটী অশ্বত্থতলে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া রৌদ্রের দিকে চাহিতে চাহিতে রামকৃষ্ণের দৃষ্টি স্থির হইল—রামকৃষ্ণ দেখিলেন, আকাশের ভিতরে যেন ও কি রহিয়াছে—দেখিবামাত্র রামকৃষ্ণের মাথা ঘুরিয়া পড়িল—বালক রামকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হইলেন। ২॥ ঘণ্টার পর রামকৃষ্ণের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। রামকৃষ্ণের তারপর হইতেই ঠাকুর, দেবতা দেখিলেই সেই কথা মনে পড়িত, এবং অমনি শরীর কণ্টকিত হইত, দুচক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। রামকৃষ্ণের জননী ভূতগ্রস্ত ভাবিয়া স্বামীকে পুত্রের চিকিৎসার জন্য কহিতেন; পিতা "রঘুজী ভরসা ভয় কি?" বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিতেন।

বালক রামকৃষ্ণ ৯ বৎসরে আকাশে যে ভাবে মহাশক্তির প্রকাশ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়েন, হজরত মহম্মদ পর্ব্বতের উপর হইতে আকাশে সেই ভাবের ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ দেখিয়া

---

* রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় স্বীয়বন্ধু মহাসাধু মহিমচন্দ্র নকুলাবধূত মহাশয়কে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ সময়ে সময়ে বলিতেন—বলিতে বলিতে ভাবাবেশ হইত।

মূর্চ্ছিত হয়েন। মহম্মদের মুখ দিয়া গ্যাঁজলা ভাঙ্গিয়াছিল—কিন্তু বালক রামকৃষ্ণের মুখ দিয়া গ্যাঁজলা ভাঙ্গে নাই। এসম্বন্ধে রামকৃষ্ণকে বড় বলিতে হইবেক। ইহা রামকৃষ্ণের পূর্ব্ব জন্মের সাধনার ফল। ভগবানের কৃপা না হইলে, কেহ কি তাঁরে দেখিতে পায়?

"তুমি নাহি দিলে দেখা কেহকি দেখিতে পায়
তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায়।"

(ব্রহ্মসঙ্গীত)



তরুণ বয়সে।

রামকৃষ্ণের সুন্দর দেহ, রামকৃষ্ণের মিষ্ট গলা, রামকৃষ্ণের ভক্তপ্রাণ। ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া সজল চক্ষে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যখন আপনা হারা হইয়া রামকৃষ্ণ গাহিতেন :—

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামাসুধাতরঙ্গিনী
লম্ফে ঝম্ফে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দেও জননী। ইত্যাদি

তখন মনে হইত যেন রামপ্রসাদ সেন স্বয়ং আসিয়া গান গাহিতেছেন। সে গান শুনিতে শুনিতে মানুষের দিব্যজ্ঞান ফুটিত; পাষাণপ্রাণ গলিয়া যাইত; সংসারদগ্ধ প্রাণে যেন অমৃত বর্ষিত হইত। কোকিলের ঝঙ্কার, পাপিয়ার শব্দতরঙ্গ, চাতকের ক্ষীণস্বর শুনিলে কাহার প্রাণে আনন্দ না হয়? কিন্তু শ্যামল লতা মণ্ডপের মধ্যে প্রবাহিনীর তটে বসিয়া রামকৃষ্ণ যখন কালী-

কীর্ত্তন গাহিতেন, গাহিতে গাহিতে এই জড়তাময় মোহপূর্ণ সংসারের উপরে ভক্তির অমৃতস্পর্শে বিভোর হইতেন; তখনকার গানের প্রত্যেক শব্দে প্রত্যেক সুরে যেন অসংখ্য কোকিল, পাপিয়ার স্বরমাধুর্য্য ডুবিয়া যাইত—সে ভক্তপ্রাণ নিঃসৃত অমৃতের কাছে আর সমুদয়ই যেন অতি তুচ্ছ অতি অসার বলিয়া বোধ হইত। একদিন রাত্রে পথের ধারে বসিয়া রামকৃষ্ণ রামপ্রসাদরচিত একটী গান গাহিতেছিলেন, পথের লোকে শুনিতে শুনিতে "আহা! আহা!" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। দু একজন দাঁড়াইয়া বালকের দিকে চাহিয়া শুনিতে শুনিতে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। এই দুইজনের মধ্যে একজন বেশ্যালয়ে যাইতেছিলেন। গান শুনিতে শুনিতে পাপিষ্ঠের হৃদয়ে সুভাবের প্রবাহ ছুটিল। রামকৃষ্ণের গান বন্ধ হইল। রামকৃষ্ণ উঠিয়া চলিয়া যান দেখিয়া সেই ব্যক্তি রামকৃষ্ণের হাত ধরিল। রামকৃষ্ণকে আর একটী গান গাহিতে বলিলে রামকৃষ্ণ আবার আরম্ভ করিলেন। পাপীর হৃদয় গলিয়া গেল—দিব্যজ্ঞান ফুটিল; পাপী দেখিল রূপসী স্ত্রী না রূপসী বাঘিনী।

এই ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন। ইনি বলেন সেই দিন হইতে আমার বেশ্যাসক্তি দূর হয়। ইনি রামকৃষ্ণের নিকট মাঝে মাঝে যাইয়া উপদেশ লইতেন। ইনি এখন সন্ন্যাসী।

এ ঘটনাটী কলিকাতায় ঘটে। রামকৃষ্ণ তখন কলিকাতার ঝামাপুকুরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে থাকিতেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের ঝামাপুকুরে একটী টোল ছিল। রাম কৃষ্ণ লেখা পড়ায় ইস্তফা দিয়াছিলেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কোন

ভদ্রলোকের বাড়ি হইতে পূজা করিয়া চাল কলা বাঁধিয়া আনিতে দেখিলেন। দেখিয়া ভাবিলেন, এত শাস্ত্র পড়িয়া শেষে এই ফল "চাল আর কলা"। চাষারা যাহা পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পায়, ব্রাহ্মণের পরিশ্রমেরও সেই ফল। চাষা ও ব্রাহ্মণে পার্থক্য কই? যে বিদ্যা শিখিবার ফল চাল কলা, আমি মরিয়া গেলেও সে বিদ্যা শিখিব না। যিনি ঐ চাল কলার সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁকে যে বিদ্যায় পাওয়া যায় আমি সেই বিদ্যা শিখিব। রামকৃষ্ণের জীবনের অস্থি-মজ্জায় এই স্বর্গীয়ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ তরুণ বয়সেই বুঝিয়াছিলেন এ জগতে সবই অসার—সার সেই ভগবান। যাহাতে তাঁকে পাওয়া যায় এরূপ সাধনই মানুষের কর্ত্তব্য। একদিন কয়েকটী সমবয়স্কের সহিত রামকৃষ্ণ এক স্থানে বসিয়া আছেন। তাহারা আপন আপন জীবনের ভাবী আশার কথা কহিতেছেন। একজন বলিতেছে, আমি ঐ দিগম্বর মিত্রের মত হইব। আর একজন বলিতেছে, আরে ছ্যা! আমি ন্যায় ভূষণের মত পণ্ডিত হইব। রামকৃষ্ণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। সকলেই আপনার আশানুযায়ী কথা কহিল। রামকৃষ্ণ কিছু বলিল না দেখিয়া, অন্যেরা রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসিল "কই! তুমি কি হবে"?

রামকৃষ্ণ হাসিয়া বলিল—"তা আমি জানি না"।

অন্যেরা বলিল "তোমার ইচ্ছা কি হও?"

রামকৃষ্ণ বলিল "আমি মার পূজারি বামুন হইব"।

হো হো করিয়া কয়জনে হাসিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ চুপ করিয়া থাকিলেন।

রামকৃষ্ণ মার প্রকৃত পূজারি ব্রাহ্মণই হইয়াছিলেন। মার পূজা বর্ত্তমান সময়ে রামকৃষ্ণের মত কে করিতে পারিয়াছে? ধন্য রামকৃষ্ণ! তোমার মত পূজারি ব্রাহ্মণ হওয়া শত জন্মের তপস্যার ফল। এখনকার যাঁরা পূজারি ব্রাহ্মণ, তাঁরা মার পূজার ফল স্বরূপ "চাল কলা" পান। আর তোমার মত পূজারি ব্রাহ্মণেরা পূজার ফলস্বরূপ "মার দর্শন" পান। এই সময়ে রামকৃষ্ণের বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইবে। ১৪ কি ১৫ বৎসরের রামকৃষ্ণ একদিন ঠন্‌ঠনের কালীতলায় যান। সন্ধ্যার পর কালীর সম্মুখে বসিলেন। মার দিকে চাহিতে চাহিতে রামকৃষ্ণের গায়ে কাঁটা দিল। রামকৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া পাগলের ন্যায় একদিকে চলিলেন। বরাবর কালীঘাটের দিকে যাইতেছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের হুঁস নাই কমনে যাইতেছেন রামকৃষ্ণ রাত্রে বেহুঁস চলিতেছেন—গাড়ি দ্রুতবেগে পার আঙুলের পাশ দিয়া যাইতেছে—রামকৃষ্ণের হুঁস নাই—রামকৃষ্ণ একবারে কালীমন্দিরের কাছে গিয়া উপস্থিত। মন্দিরের কাছে গিয়াই রামকৃষ্ণের ভাবাবেশ হইল—রামকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে রামকৃষ্ণের দাদা রামকৃষ্ণকে খুঁজিয়া পান নাই—তিনি সমস্ত সহর খুঁজিয়াছেন—রাত্রে ঘুম নাই—রামকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল। শেষরাত্রে দাদার একটু নিদ্রাকর্ষণ হইবামাত্র স্বপ্নে দেখিলেন, রামকৃষ্ণ কালীঘাটের কালীমন্দিরের পাশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া রামকুমার দ্রুতবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিলেন। পথে রামকৃষ্ণের সহিত দেখা হইল। রামকৃষ্ণের মাথায় কাদা, গালে

কাদা। রামকৃষ্ণের কান্নার জলে মাটী ভিজিয়া কাদা হইয়াছিল—সেই কাদা গালে লাগিয়াছে, মাথার চুলে লাগিয়াছে।

এই সময়ে জানবাজারের রাণী রাসমণি দক্ষিনেশ্বর নামক স্থানে, গঙ্গার উপরে, দ্বাদশ মন্দির ও কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত করেন। যে দিন রাসমণি কালীপ্রতিষ্ঠা করেন, সে দিন মহা সমারোহ হয়। রাসমণি নীচজাতীয়া, এজন্য আপন গুরুর নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। সে দিন অনেক কাঙ্গালী বিদায় হইল-লোকে লোকারণ্য হইল। অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া বিবিধ মিষ্টান্নাহারে ও উপযুক্ত দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত হইয়া, রাসমণিকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বিদায় হইলেন। কিন্তু কেন তা বলা যায় না, রামকৃষ্ণ সে দিন কিছুই খান নাই। সে দিন রামকৃষ্ণ মুদির দোকান হইতে এক পয়সার মুড়কি খাইয়া কলিকাতায় চলিয়া যান।

রামকৃষ্ণের বড় দাদা রামকুমার কালীবাড়িতেই থাকিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণও বড় দাদার কাছে আসিয়া থাকিলেন।

এই সময়ে রামকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির বেশকারী নিযুক্ত হয়েন। তার পর উক্ত দেবদেবীর পূজক এবং কিছুকাল পরে কালীর পূজক নিযুক্ত হয়েন।



সমাধি না কি?

বসন্ত কাল। রাত্রিশেষে রামকৃষ্ণ ফুলের চুপড়ি লইয়া গুন গুন স্বরে গান করিতে করিতে ফুল বাগানে প্রবেশ করিলেন। বাগানে নানাবিধ ফুল ফুটিয়াছে। গাছের ডালে ডালে, স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়াছে। ডালে, উপডালে সবুজ সবুজ পাতার কোলে কোলে ফুল ফুটিয়া বাগানকে শোভার ভাণ্ডার করিয়াছে। মৃদু মৃদু বাতাসে গাছের সপুষ্প শাখা উপশাখা নাচিতেছে। ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় শিশিরের ফোঁটা ফোঁটা জল, মুক্তা ফলের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে। ফুলের গন্ধে ভারি হইয়া বাতাস নাকে বড় আরাম দিতেছে—কপালে চোখে ঘুমের আবেশের মত আরাম দিতেছে। ভ্রমর গুন গুন গুন গুন করিয়া ফুলের উপরে বসিতেছে—এফুল হইতে ও ফুলে বসিতেছে—এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিতেছে। এমন শোভা রামকৃষ্ণ একদিনও দেখেন নাই—প্রাতঃকালীন বাতাসের এমন সদ্ভাবোদ্দীপকস্পর্শ কখনও অনুভব করেন নাই—কালভ্রমরের এমন দেবস্বরপূর্ণ সঙ্গীত কখনও শ্রবন করেন নাই—আজ প্রকৃতির এই সজীব আনন্দপূর্ণমূর্ত্তি দর্শনে আপনহারা হইয়া রামকৃষ্ণ কালীকীর্ত্তন গাহিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ গান গাহিতে গাহিতে ফুল তুলিতে লাগিলেন। ফুল তুলিতে তুলিতে রামকৃষ্ণের হৃদয়ের ভাব ঘন হইয়া আসিল। ফুল তুলিতে

ভূমিতে যখন চুপড়ি হাতে মাধবীলতা-পরিবেষ্টিত বেল-মল্লিকা-যুঁথি-বিভূষিত একটী মনোহর উদ্যানাংশে উপস্থিত হইলেন—তখন মাধবী ফুলের আভায়, বেল মল্লিকার শোভায় এক স্বর্গীয় ভাব অনুভব করিলেন। সেই শোভার আড়ালে এক অনন্ত শোভার মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। সেই অনন্ত শোভায় মাধুরি—সেই অনন্ত শোভায় প্রাণের তরঙ্গ—সেই অনন্ত শোভায় আনন্দের ঘন মূর্ত্তি দেখিবামাত্র রামকৃষ্ণের অস্তিত্ব সিহরিয়া উঠিল; রামকৃষ্ণের হাতের চুপড়ি পড়িয়া গেল; রামকৃষ্ণের ভিতরে জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এই তিন ভাব মিশিয়া এক হইল। যেমন সূর্য্য আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, সেইরূপ রামকৃষ্ণের আত্মা আপন জ্যোতিতে আপনাকে প্রকাশ করিল। চৈতন্যের যাহা বিন্দু তাহা চৈতন্যের সিন্ধুতে মিশিল। ক্ষুদ্র যাহা তাহা অনন্তে এক হইল। রামকৃষ্ণ জগতের প্রস্রবণ মধ্যে শান্তি বারি পানে বিভোর হইলেন। এই রামকৃষ্ণের প্রথম সমাধি।

সমাধির কথা অনেকবার থাকিবে। অনেকে সমাধি কি তা বুঝেন না। সমাধি কি তাহা পরের অধ্যায়ে বুঝাই।

সমাধি কি ?

মনুষ্য যে অবস্থা হইতে বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে সেই অবস্থাকে সমাধি কহে। ইহা সমাধির লক্ষণ। ইহাতে কিছুই কিন্তু বুঝা গেল না। এই বিষয়টী বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করি।

আমাদের জ্ঞান চক্ষের ভিতর দিয়া দেখে, কাণের ভিতর দিয়া শুনে, নাকের ভিতর দিয়া আঘ্রাণ লয়। এইরূপে যাহা শুনি, দেখি, স্পর্শ করি, অনুভব করি সবই জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানের প্রথম অবস্থায় যাহা বাঁধাবাঁধির ভিতর দিয়া অনুভূত হয় তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। জ্ঞান যখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া কার্য্য করে—তাহা জ্ঞানের বাঁধাবাঁধি অবস্থা। বাহেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় এবং আমাদের রিপুর গোলমালের ভিতর দিয়া জ্ঞানের যা অনুভূতি তাহা ঠিক অনুভূতি নহে। যেমন আঙুলে চাদর জড়াইয়া কোন বস্তু স্পর্শ করিলে স্পর্শজ্ঞান ঠিক হয় না—চোখের উপর একটা পাতলা চাদর রাখিয়া দেখিলে, দর্শনজ্ঞান ঠিক হয় না; সেইরূপ আমাদের জ্ঞানের উপরে ইন্দ্রিয়াদি নানা ব্যাপার চাপা থাকায় জ্ঞানের প্রকৃত অনুভূতি হইতেছে না। ইহার সমস্ত বন্ধন মুক্ত না হইলে বস্তুর প্রকৃত সত্ত্বাবোধ হইবে না। জ্ঞান যখন বাহেন্দ্রিয় হইতে বিদায় লইয়া অন্তরের বিষয় অনুভব করে তখন অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রবল হয়;—আবার অন্তরিন্দ্রিয়ের নিকট বিদায় লয়; তখন আমাতে ইহার দীপ্তি প্রখর হয়; তখন আমি আমাকেই অনুভব করি অর্থাৎ আমি তখন জ্ঞাতা—আমিই তখন জ্ঞেয়—আমিই তখন জ্ঞান—তখন আমি আমাকে স্পষ্ট অনুভব করি—তখন আমি যে কি স্পষ্ট বুঝিতে পারি—এই যে অবস্থা ইহাকে বলে সমাধি।

আমাদের জ্ঞানের দুটা দিক আছে। একটা পরিবর্ত্তনের আর একটা অপরিবর্ত্তনের। জগতে যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি সবই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই যে পরিবর্ত্তন এই যে

কাণ্ড, ব্যাপার, ঘটনা-চক্র, এ সমস্ত—একটা ভিত্তির উপরে হই-তেছে। যেমন মনে কর একটা কমলালেবু। ইহার রং, গন্ধ, কঠিনত্ব ও কোমলত্ব এবং মিষ্টত্ব এই সমস্ত যে গুণ—এ গুলা একটা আধার অবলম্বন করিয়া আছে। সেই আধারটাই উহার প্রকৃত সত্তা। অনুমান দ্বারা ইহা জানিতেছি। সে সত্তাটুকু যে কি ঠিক জানিতেছি না। সেই প্রকৃত সত্তা আমার সত্তার ভিতর দিয়া জানিতে পারিব। যেমন আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদির সহিত, আমার প্রত্যেক পরমাণুর সহিত ঐ কমলালেবুর সম্বন্ধ আছে; আমার সত্তার সহিত উহার সত্তারও সম্বন্ধ আছে। আমার সত্তার জ্ঞানে প্রবেশ করিতে পারিলে ঐ কমলালেবুর সত্তার জ্ঞানেও প্রবেশ করিতে পারিব। সমস্ত জগতের সত্তা ও আমার সত্তা এক—সমাধি দ্বারা ইহা বুঝা যায়।

রামকৃষ্ণের বিবাহ।

রামকৃষ্ণের যখন বয়স ১৬ বৎসর তখন বিবাহের সম্বন্ধ হইল। রামকৃষ্ণ ভাবিলেন, "বিবাহ কি করিব? মানুষ বিবাহ করিয়া ভগবানকে ভুলে, ধর্ম্মকে ভুলে। আমি কি বিবাহ করিব? বিবাহবৃক্ষে সন্তান ফল মায়ার মধুরতায় পরিপূর্ণ। সেই এক ফোঁটা মধুতেই মানুষকে মাতাল করিয়া ফেলে—মানুষ জ্ঞানহারা হইয়া পরকাল একবারে বিস্মৃত হয়! মানুষ একটা পেটের জন্যই কত চুরি ডাকাইতি করে। আবার

৩। ৪ টী পেট যদি একটী পেটের সঙ্গে যুড়িয়া যায় তো মহা সর্ব্বনাশ! বিবাহ কি করিব? আবার ভাবিলেন, যদি বিবাহ করিয়া স্ত্রীর ভিতরে মহামায়াকে দেখি, মার পূজা করিতে পারি তো একটা বিবাহ কেন দশটা বিবাহ করিতে দোষ নাই। প্রলোভন মধ্যে থাকিয়া যে ভগবানকে লাভ করিতে পারে সেই প্রকৃত বীর। অতএব বিবাহে দোষ নাই। বিবাহ করিব কিন্তু কুকুর, বিড়ালের ব্যবহার স্ত্রীর সহিত করিব না। আমার স্ত্রীযোনিতে জন্ম; সুতরাং যত স্ত্রী সবই আমার মা। লোকে যে প্রকারে বিবাহকে ভাবে, দেখে, ব্যবহার করে, আমি সে ভাবে করিব না। অতএব বিবাহ করিব। বিবাহ করিব কিন্তু নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা একদিনও স্ত্রীকে স্পর্শ করিব না। বাহিরের স্ত্রীকে কাছে রাখিয়া আমার ভিতরের স্ত্রীকে (স্ত্রী ভাবকে) ফুটাইব। বাহিরের স্ত্রীকে দেখিতে দেখিতে নিজে স্ত্রীভাবে পূর্ণ হইয়া জগৎস্বামীকে "স্বামী" বলিয়া সম্বোধন করিব। মানুষের স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্ত্রীভাব (কোমল ভাব) বিকাশের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। বাল্যকালে জননী ও ভগিনী সে ভাব অতিশয় পবিত্র ভাবে ফুটাইয়াছেন। এখন যৌবনে অন্য স্ত্রীকে কাছে রাখিয়া সে সব ভাবের বিকাশ করিতে হইবে—অতএব বিবাহ করাই ঠিক।

১১ বৎসরের রামকৃষ্ণ এত গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়াছিলেন—ইহা আশ্চর্য্য বটে!

কামারপুকুরের সন্নিকটস্থ জয়রামবাটী নামক গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত রামকৃষ্ণের বিবাহ হইল। কন্যার নাম শ্রীমতী সারদামণি—তখন বয়স ৮ বৎসর।

রামকৃষ্ণ শ্বশুরালয়ে।



বিবাহের পর রামকৃষ্ণ কখন কখন সেই চেলীরকাপড়পরা ক্ষুদ্র মেয়েটীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। সেই মেয়েটীকে ভাবিতে ভাবিতে রামকৃষ্ণের মন হিমালয়ে মেনকার কোলে গিয়া একটী মেয়েকে দেখিত। সেই মেয়েটী অসংখ্য মূর্ত্তিতে কত লোকের স্ত্রী হইয়াছেন, কত লোকের ভগিনী সাজিয়াছেন। আপনহারা হইয়া পুত্রবতী হইয়া পুত্রমুখে স্তনদান করিতেছেন আবার সেই পুত্রের মুখে শ্মশানে অগ্নি নিক্ষেপ করিতেছেন। তিনিই গৃহস্থের কুলবধু সাজিয়া ঘোমটা মুখে দিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করিতেছেন; তিনিই আবার প্রখরা অসি হস্তে নিদ্রিত স্বামীর বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে রামকৃষ্ণ সিহরিয়া উঠিলেন। ভক্তিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভাবিতেছেন যেন আপনি মহাদেব আর তাঁর স্ত্রী সতী। এইরূপে, সেই চেলীরকাপড়পরা মেয়েটীর কথা মনে আসিলেই রামকৃষ্ণের মনে কত ভাবের তুফান উঠিত।

রামকৃষ্ণকে একবার তাঁর শাশুড়ী লইয়া গিয়াছিলেন। তখন রামকৃষ্ণের বয়স ২২ কি ২১ বৎসর। রামকৃষ্ণ শ্বশুরবাড়ি গেলেন। শালীরা জামাইকে ঘেরিয়া বসিল কত ঠাট্টা তামাসা করিল। রামকৃষ্ণ সেই ততগুলি শালী, শালাজের ভিড়ের

মধ্যে বসিয়া আছেন—বসিয়া একটী গান গাহিতেছেন, এমন সময়ে একটী বৃদ্ধা সারদামণিকে কোলে করিয়া আনিয়া রামকৃষ্ণের কোলে বসাইয়া দিল। স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ হইবামাত্র রামকৃষ্ণের শরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল—রামকৃষ্ণ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কেন যে এপ্রকার হইয়াছিল বুঝিতে পারি না।

সেইদিন রাত্রে স্ত্রীর কাছে রামকৃষ্ণকে শুইতে বলিলে রামকৃষ্ণ গিয়া শয়ন করিলেন। রামকৃষ্ণ স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া শয়ন করিয়া—কত কি ভাবিতেছেন। হঠাৎ স্ত্রী জাগ্রত হইলেন। তখন রামকৃষ্ণ স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া ভাবভরে কহিলেন "আমরা যেন দুই মাসী বোনপোয় শুইয়াছি নয়?"

একদিন পরেই রামকৃষ্ণ শ্বশুরবাড়ি হইতে দক্ষিণেশ্বর ফিরিয়া আসিলেন। রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া কোথাও অধিকদিন থাকিতে পারিতেন না। তাঁর সেই "কালী" মার জন্য বড় মনকেমন করিত। শ্বশুরবাড়ি হইতে যখন আসিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, তখন একটী বৃদ্ধ আর একদিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে, রামকৃষ্ণ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিয়াছিলেন "আমার মার জন্য বড় মনকেমন করছে"। এমা আর কেহ নহেন দক্ষিণেশ্বরের "কালী" মূর্ত্তি।

এই কথাটীর ভিতরে একটা ধর্ম্মসাধনের গভীর রহস্য আছে। সেটী আমি পর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করি।



দেবমূর্ত্তিতে মায়া।

রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যেমন কাঁটা দ্বারা কাঁটা বাহির করিয়া, পরিশেষে দুটাকেই ফেলিয়া দিতে হয়, সেইরূপ মায়া দ্বারা মায়া বাহির করিয়া পরিশেষে উভয়কেই ফেলিয়া দিতে হয়।" হোমিওপ্যাথিক মতে যাহা দ্বারা যে রোগ হয়, তাহা দ্বারা সেই রোগের বিনাশ করিতে হয়। তন্ত্র শাস্ত্রের মতও তদ্রূপ।

অনেক সাধক স্ত্রীপুত্রাদির মায়া দেবদেবীমূর্ত্তিতে আবদ্ধ করিয়া পরিশেষে মায়াকে বিনাশ করিয়াছেন। নিরাকার ঈশ্বরের জ্ঞান বড় শক্ত। অদৃশ্যবস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস হইতে পারে। পৃথিবীর চিন্তাশীল মহাত্মারা শ্যামলা প্রকৃতির মধ্যে সেই নিরাকার বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁর উপাসনা করিতে পারেন; কিন্তু সকলের প্রকৃতি সমান নহে। নিরাকার উপাসনা বড় শক্ত, সকলে পারে না। সাকার উপাসনা বড় সহজ সকলেই পারে। একটা মোটা জিনিসে মন স্থির করিয়া তার পর সূক্ষ্ম জিনিসে গেলে বড় ভাল হয়। প্রকৃত সাকার উপাসনা কি প্রকার রামকৃষ্ণ তাহা দেখাইয়াছেন। 87

একটী সুন্দর মৃত্তিকা বা প্রস্তরমূর্ত্তি। যেমন কালী বা সর্ব্বমঙ্গলা বা জগদ্ধাত্রী। তোমার যাহা ভাল লাগে। যে মূর্ত্তিটীতে তোমার ভক্তি হয়। সেই মূর্ত্তির কাছে বসিয়া থাক। তাঁর পূজা কর। তাঁকে "মা" "মা" বলিয়া ডাক। তাঁকে সাজাইবার জন্য বনে বনে ঘুরিয়া যত ভাল ভাল ফুল

তুলিয়া আন। তাঁর সেবার জন্য ভাল ভাল খাবার সংগ্রহ কর। যদি তুমি কোন দেবমূর্ত্তির কাছে এইরূপ অধিক দিন থাক, তো তোমার একটা মায়া তাহাতে বসিবে। তাঁহাকে "মা" "মা" বলিয়া যদি কিছুকাল ডাক, ভাব, তো তোমার তাঁকে ঠিক মার মত বোধ হইবে; মার মত ভক্তি হইবে। তুমি রাত্রে আর ঘরে থাকিতে পারিবে না। যেমন কচিছেলে মার কাছ না হইলে শয়ন করে না, তোমার তখন সেই দশা ঘটিবে। তুমি মার ঘরে না শুইয়া থাকিতে পারিবে না। তোমার স্ত্রীকে ছাড়িয়া সেই দেবীমূর্ত্তির কাছে থাকিতে ইচ্ছা হইবে। তোমার ছেলে পুলে ছাড়িয়া সেই দেবীমূর্ত্তিকে ছেলে পুলের মত ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইবে।

তোমার ছেলেপুলের, স্ত্রী কন্যার, কত ব্যারাম পীড়া হয়, তুমি কত জ্বালাতন হও; কিন্তু এই মূর্ত্তিতে সে সব আপদ বিপদ জ্বালা যন্ত্রণা আদতে নাই। খাইতে দাও বা না দাও—যদি একবার একটু মায়া ঐ দেবদেবী মূর্ত্তির উপরে ভগবান ভগবতী জ্ঞানে আবদ্ধ করিতে পার, তো, তোমার ঐ সামান্য মায়া এক দিন প্রকাণ্ড হইয়া তোমার সব মায়াকে গ্রাস করিবে—তখন তুমি মহামায়ার কৃপায় মায়ার অতীত হইবে। সাকার উপাসনায়—পরিমিত মূর্ত্তি সাধনায় এই একটা হোমিওপ্যাথিক উপকারিতা এমনি চমৎকার, যে অন্য কোন পদ্ধতিতে সেরূপ নাই। নিরাকার উপাসনা অপেক্ষা এইরূপ সাকার উপাসনা আশুফলপ্রদ।

রামকৃষ্ণ প্রথমে জগতের যত মায়া সব দক্ষিণেশ্বরের কালীর পাদপদ্মে জড়, করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁর মার জন্য বড়

মন কেমন করিত। মাকে ছাড়িয়া—সেই কালীমূর্ত্তিকে দূরে রাখিয়া, রামকৃষ্ণ কোথাও থাকিতে পারিতেন না। রামকৃষ্ণের সমস্ত তীর্থ সেই মার চরণে ছিল—সমস্ত শাস্ত্র সেই মার মুখে ছিল। রামকৃষ্ণ তাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া মার কাছে আবদার করিতেন "মা! আমি তোর আঁচল ছেড়ে কোথাও যাব না।"

দেবদেবী মূর্ত্তিতে যখন এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তি হয়—টান হয়—মায়া হয়—একাগ্রতা হয়—তখন সাধক ডাকিবা মাত্র সেই মূর্ত্তির ভিতর হইতে মা সাড়া দেন—দেখা দেন—উপদেশ দেন। এই অবস্থা হইলে সাধকের সিদ্ধাবস্থা হয়। তখন আর সে মূর্ত্তিতে মায়া বদ্ধ থাকে না—কারণ যখনই মা বলিয়া সাধক ডাকে মা অমনি দেখা দেন। তখন সেই চৌদ্দপোয়া মূর্ত্তি এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের মূর্ত্তি সমান হইয়া যায়। কালীঘাটের কালীর পাথর ও পথের পাথর সমান হইয়া যায়—কালীমন্দির ও ব্রহ্মাণ্ড মন্দির এক হইয়া যায়। রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাকারোপাসকের এইরূপে এক একটী সাকার মূর্ত্তিতে মায়া আবদ্ধ করিয়া মাহামায়াকে লাভ করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত সাকার উপাসনা। এই সাকার উপাসনা সকলের পক্ষে সহজ। ইহাতে চক্ষু বোজা নাই, নিশ্বাস টানা নাই, মস্তিষ্ক আলান নাই—ইহা অতি সহজ স্বাভাবিক পথ—ভবরোগের সহজ মহৌষধি।

মায়ের সহিত সংগ্রাম।

কলির কে দুর্দ্দান্ত প্রভাব! কলিতে এই জন্যই মনের পাপ কে ভগবান ক্ষমা করিয়াছেন। নহিলে ভগবানের দয়াময় নামে কলঙ্ক পড়িত। কিন্তু পাপ যতই পরাক্রান্ত হউক না কেন, সাধুদিগকে কুক্রিয়ান্বিত করিতে পারে না। বিশেষতঃ যাঁহারা জগতে ভক্তিপথের যাত্রী—যাঁহারা আপনাদিগকে হাড়ি মুচি চণ্ডাল এমন কি বিষ্ঠার কৃমি অপেক্ষাও অধীন মনে করেন, তাঁহাদের পতন সম্ভাবনা হইলে ভগবান স্বয়ং আসিয়া রক্ষা করেন। হঠযোগাদি কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে যাঁহারা সাধনার পথে অগ্রসর হন; তাঁহারা মহা প্রলোভনে প্রায় আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না; কিন্তু যাঁহারা ভগবানের নামকে সার জানিয়া দিবারাত্র নামামৃত পানে বিভোর, তাঁহাদের প্রলোভন-বিপদে বিপদভঞ্জন মধুসূদন সহায় হইয়া থাকেন। যোগপথাবলম্বী ও ভক্তিপথাবলম্বীদিগের মধ্যে ভক্তিপথাবলম্বীরাই অধিক নিরাপদ। ইহাঁদের দীনতার মূর্ত্তি দেখিলে পাপের হৃদয়েও বুঝি করুণার সঞ্চার হয়।

রামকৃষ্ণের কয়েকবার সমাধি হইলে—রামকৃষ্ণ একদিন ভাবিতেছিলেন আমি সিদ্ধ হইয়াছি, পাপ আর আমাতে নাই। লোকে সুন্দরী যুবতী দেখিলে এত পাগল হয় কেন? মাংসের মূর্ত্তিতে একটু না হয় চাঁদপানা বর্ণ আছে! ঠোঁটে

না হয় একটু গোলাপফুলের রংই আছে! বুকে না হয় দুটী নরম মাংসপিণ্ড আছে! হাসিতে না হয় বিদ্যুৎই পরাস্ত হইল! উহাতে মনে কুভাব উঠে কেন? মানুষের কি মূর্খতা! মানুষ বুঝিয়াও বুঝে না! দেখিয়াও দেখে না! আমার মনে তো কখনও কুভাবের উদয় হয় নাই। মানুষ যদি আমার মত ভগবান লইয়া থাকিত, তো বিপদে পড়িত না। আমি ভালই আছি। ধনমানকে পরিত্যাগ করিয়া আমি সিদ্ধপুরুষ হইয়াছি আমার আর ভয় নাই—পাপ আর আমার কিছু করিতে পারিবে না।

রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে এইরূপ ভাবেন। তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন এই ভাবে কয়েকদিন কাটাইয়াছেন—সে ভাবটা যে অহংকার তাহা রামকৃষ্ণ বড় বুঝেন নাই। একদিন গঙ্গার বাঁধাঘাটে বসিয়া আছেন। গঙ্গার জলে রৌদ্রের আভা পড়িয়া জলকে চাকচিক্যময় করিয়াছে—শীতকালের নির্ম্মল জলে ঢেউ উঠিতেছে। রামকৃষ্ণ গঙ্গার ঘাটের দিকে দেখিতেছেন ছেলে, মেয়ে স্নান করিতেছে। একটী সুন্দরী যুবতী পাতলা আর্দ্র বস্ত্রে দেহ আচ্ছন্ন করিয়া জলপূর্ণ ঘড়া কক্ষে জল হইতে উপরে আসিতেছে। সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা যখন পাতলা ভিজা কাপড়ে গা অাঁটিয়া যায় তখন সৌন্দর্য্যের একটা প্রখরতা বর্দ্ধিত হয়। রামকৃষ্ণের ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল—সেই সুন্দরী যুবতীর দিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ রামকৃষ্ণ সিহরিয়া উঠিল। বুকের রক্ত গরম হইয়া উঠিল—রামকৃষ্ণ—"বাপরে" বলিয়া বিকট শব্দে সেখান হইতে উঠিয়া দৌড় দিলেন। অন্যান্য লোকেরা কিছু বলিলনা—অনেকেই রামকৃষ্ণকে পাগল বলিয়া জানিত।

রামকৃষ্ণ আপন গৃহে গেলেন। ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় তাঁর কালীমাকে ডাক দিলেন। অমনি কালীমা দেখা দিলেন—রামকৃষ্ণ করযোড়ে কহিলেন "মা! আমার এমন হ'ল কেন? মা! আমার প্রাণ যায় মা!"

তখন মা নিমেষের মধ্যে "তুইনা সিদ্ধ হয়েছিস" এই কথা বলিয়া অদৃশ্যা হইলেন।

তখন রামকৃষ্ণ কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। কাটা ছাগলের ন্যায় ছটফট করিলেন। যাতনা পলে পলে তুঁষের আগুনের ন্যায় রামকৃষ্ণকে পুড়াইতে লাগিল। মস্তিষ্কে যেন আগুণ জ্বলিতে থাকিল; হাড়ের ভিতরে যেন শাণিত অস্ত্র চালিত হইতে থাকিল। কখন ভূমে মাথা খুঁড়েন—কপাল ফাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কখন খড়ম লইয়া আপনি "বড় নাকি সিদ্ধ হইয়াছ" বলিয়া আপনার দুগালে মারিতে থাকিলেন। রামকৃষ্ণ সেই অনুতাপানলে এত অস্থির হইয়াছিলেন যে ৩ দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই; এবং ৭ রাত্রি আদতে নিদ্রা যান নাই।

এই অবস্থার পর রামকৃষ্ণের জীবনে এক প্রলয় হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ কিছু কালের মধ্যেই এত উন্নত হইলেন যে সঙ্কীর্ত্তনের সময় মহাভাবের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকিল। এ সমস্ত কথা পুস্তক মধ্যে সবিস্তারে পাইবেন। এখন মায়ের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধের কথা বলি—পাঠকগণ! শ্রবণ করুন।

কিছুকাল পরে একদিন রামকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিতেছিলেন সেই ভীষণ কামসর্পটা আমার ঠাকুরঘরের বিল্বপত্রাদির ভিতরে

লুকাইয়া আছে কি না—একবার পরীক্ষা করিলে হয়। কিন্তু কি প্রকারে পরীক্ষা করিবেন—তাহার সুযোগ পান না। কিন্তু মা একটী ঘটনা আনয়ন করিলেন।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু রামকৃষ্ণ কি প্রকার সাধু তাহা পরীক্ষা করিবার মতলবে ফিরিতেছিলেন।

একদিন মথুরবাবু সোনাগাছির লক্ষ্মীবাই নামিকা কোন বেশ্যার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটী সুন্দরীর ব্যূহ রচনা'র আয়োজন করিলেন। ১৫।১৬ বৎসরের পরমাসুন্দরী যুবতী-দলের মহাস্ত্রনিক্ষেপণের মধ্যে রামকৃষ্ণকে ফেলিয়া পরীক্ষা করিবার আয়োজন করা হইল। এজন্য মথুরবাবুকে অনেক-গুলি টাকা খরচ করিতে হইল।

এ বড় ভীষণ সংগ্রাম। ওয়াটারলু বল, কুরুক্ষেত্র বল, পাণিপথ বল বা ধর্ম্মাপলী বল এ যুদ্ধের কাছে সে সব কিছুই নহে।

মথুর বাবু যুদ্ধের আয়োজন করিয়া পরমহংসদেবকে আপনার গাড়িতে করিয়া কোন স্থলে বেড়াইতে যাইবার অছিলা করিয়া বাহির হইলেন। গাড়ি গড় গড় করিয়া বেশ্যা-বাড়ির দরজার কাছে আসিয়া থামিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। রামকৃষ্ণকে একবারে ত্রিতল গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। রামকৃষ্ণকে ঘরের ভিতরে দিয়াই মথুর বাবু সরিয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণ এ সব কিছুই জানিতেন না। হঠাৎ সেই ঘরের ব্যাপার দেখিয়া বুঝিলেন "এ সব মার খেলা"! আজ আমার পরীক্ষার দিন।

রামকৃষ্ণ দেখিলেন ঘরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেজে বাতি জ্বলিতেছে। এত আলো যে দিনের আলোকের ভ্রম বোধ

হইতেছে। পঞ্চদশী, ষোড়শী, সপ্তদশীতে ঘর পূর্ণ। তাহাদের গায় গন্ধে ঘর আমোদিত। তাহাদের গায় গহনা আলোকে চক্‌মক্‌ করিতেছে। প্রলোভন যতদূর বেশভূষা করিতে পারে তা করিয়াছে। নিমেষের মধ্যে যাহা চক্ষে পড়ে রামকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া মুদিত নয়নে তাহাদিগকে "মা আনন্দময়ীর জয় হউক" বলিয়া প্রণাম করিলেন।

বেশ্যারা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন আসিয়া রামকৃষ্ণের কাপড় কাড়িয়া লইল। রামকৃষ্ণ উলঙ্গ বালকের মত বসিয়া থাকিলেন। সকলেই গায়ের কাছে আসিয়া বসিল। যুবতীগণ——আর অধিক বর্ণনা করা ভাল দেখায় না। দুই এক কথায় সারিয়া দি। যুবতীগণ রামকৃষ্ণের উপস্থ ধরিল—রামকৃষ্ণ অচল অটলের ন্যায় বসিয়া সেই উলঙ্গা অর্দ্ধোলঙ্গা সুন্দরীদিগের হাব ভাব মধ্যে কেবল তাঁর কালীমার মূর্ত্তিই দেখিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণ সেই যুবতীদিগের উলঙ্গ মূর্ত্তি একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন—কিন্তু মনে আদতে কুভাব আসিল না—সে উলঙ্গিনী মূর্ত্তিতে আপনার উলঙ্গিনী কালীমার মূর্ত্তি দেখিয়া রামকৃষ্ণ মা! মা! তুমি আমার সঙ্গে অমন ক'রছ কেন মা! আমি যে তোমার পাগলা ছেলে মা! হাঁমা আমায় পরীক্ষা করছিস! মা হ'য়ে ছেলেকে কি অমন ক'রে পরীক্ষা করিতে আছে মা! রামকৃষ্ণ ভক্তিভরে রোদন করিতে করিতে কত প্রেমের প্রলাপ বলিতে থাকিলেন। সেই পাপ গৃহ রামকৃষ্ণের ভক্তির জলে পবিত্র হইল। বেশ্যাগুলা অনেক কস্তাকস্তি করিল—রামকৃষ্ণকে বাহুমধ্যে ধরিয়া নানাবিধ কুৎসিতভাবে

চাপাচাপি করিল কিন্তু রামকৃষ্ণের একটুও অঙ্গবিকৃতি দেখিল না—কেবল দুচক্ষু দিয়া জলধারা এবং পাষণ্ডভেদী "মা! মা"! ধ্বনি শুনিতে শুনিতে রাত্রি যখন অবসান প্রায় হইয়াছে তখন দুইজন বেশ্যা রামকৃষ্ণের দুটী পা জড়াইয়া ধরিল। ব্যাকুলহৃদয়ে আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে "তুই কে বাবা! তুই মানুষ না দেবতা! আমরা যে এত কস্তাকস্তি করিলাম—বাবা তুমি উলঙ্গ হইয়াছ অথচ সমস্ত রাত্রে তোমার একটুকু অঙ্গবিকৃতি দেখিলাম না"। অন্যান্য বেশ্যারা তখন যে যার কাপড় আঁটিয়া পরিল। একে একে রামকৃষ্ণকে দেবতাজ্ঞানে প্রণাম করিল। রামকৃষ্ণ তখন ভক্তির মহা বন্যায় আপ্লুত হইলেন—। দুই চক্ষু লাল—অশ্রুজলে গণ্ডস্থল বক্ষস্থল ভাসিয়াগেল—রামকৃষ্ণ করযোড়ে সেই অবিদ্যারূপিনীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আপনারা আমার মা! মা আমায় আশীর্ব্বাদ করুন! তোদের পাগল ছেলে যে সিদ্ধ হইয়াছে তজ্জন্য তোরা আমার মাথায় তোদের পায় ধূলা দে মা" সর্ব্বনাশ! ঠাকুর করেন কি? এইরূপেই কি জীবকে শিক্ষা দিতে হয়! আমাদের পাপ মোচনের জন্য আপনাকে এত দীনতায় আশ্রয় করিতে হইল! ভগবান! আর নয়—আমাদের পাপ আমাদের দেহে থাকুক—নরকই আমাদের ভাল! কিন্তু প্রভু! আপনার জীব শিক্ষার জন্য এরূপ মিনতি যে দেখিতে পারি না। রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! তুমি ভক্ত হইয়াও আজ ভগবান অঙ্গারে আগুণ ধরিলে যেমন সে অঙ্গার আগুণ হয় আর তোমাকে ভগবান ধরিয়াছেন তাই তুমি ভগবান হইয়াছ—তুমি মহা ভক্ত, তুমি স্বয়ং ভগবান।

তার পর রামকৃষ্ণ বেশ্যাদের প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইলেন। প্রথম দুইজন হতভাগিনী রামকৃষ্ণের পিছনে পিছনে সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া—রিপুর মুখে ছাই দিয়া বাহির হইলেন। রামকৃষ্ণ ইহাদিগকে ভিক্ষাব্রত দিয়াছিলেন। ইহারা টুকনি হাতে "হরিবোল" বলিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইত--এখন ইহাদের উদ্দেশ নাই। কেহ বলে বৃন্দাবনে আছে। কেহ বলে মরিয়াছে।

এই ঘটনার পর রাণী রাসমণি পরীক্ষা করিবার জন্য রামকৃষ্ণের ঘরে কয়েকটী সুন্দরীকে পাঠান। রামকৃষ্ণ উহাদিগকে মাতৃসম্বোধনে প্রণাম করিয়া বিদায় করেন।

রামকৃষ্ণের বিচার।

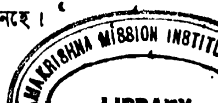
বিচার জ্ঞানের প্রকৃত পথ। বিচার জ্ঞানের ভিত্তি, ইহা কুসংস্কারের সর্ব্বনাশক অস্ত্র। ইহা মানুষের আছে অন্য জীবের নাই—এইজন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। ইহা যে মানুষে যত প্রবল সে মানুষ তত বড় তত মহান।

রামকৃষ্ণ প্রখর বিচারশক্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন। তিনি তাহার বিকাশের জন্য ন্যায় দর্শন পড়েন নাই—পড়িয়া শুনিয়া যাঁহারা পৃথিবীতে বড় রামকৃষ্ণ সে শ্রেণীর বড়লোক নহেন পৃথিবীতে যাঁহারা খুব বড়—যাঁহারা মানব সমাজের ভিত্তি—সভ্যতার স্তম্ভ তাঁহারা অধিক পড়াশুনা বড় কেহ করেন নাই ইংলণ্ডে হিউম্, লক বার্কলি ইহাদের পড়াশুনা তত বেশী যাঁহারা

ছিল না। ফ্রান্সে কোমট, জর্ম্মনিতে ক্যাণ্ট—ইহাদেরও তাই। আমাদের দেশে দেখ কেশবচন্দ্র সেন—পড়াশুনা কমই ছিল—কিন্তু স্বাভাবিক শক্তির এমনি মহিমা যে কেশব সামান্য পড়াশুনায় পৃথিবী তোলপাড় করিলেন অতবড় বিদ্বান দর্শনিক জন ষ্টুয়ার্টমিলকে পর্য্যস্ত স্তম্ভিত করিয়াদিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের কাছে কেহ নহেন। অতি প্রাচীনতম কালে হজরৎ মহম্মদ কিছুমাত্র লেখাপড়া না শিখিয়া কেবলমাত্র সরল বিশ্বাসের দুর্জ্জয় বিক্রমে পৃথিবীকে বিকম্পিত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সময়ে কিছুমাত্র লেখাপড়া না শিখিয়া চিরবালক রামকৃষ্ণ সরল বিশ্বাসের প্রভাবে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র একত্র করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের অজেয় নিশান উত্তোলন করিয়া গিয়াছেন—এই নিশান চিরকাল সমভাবে থাকিবে—হিন্দুজাতি পৃথিবী হইতে মুছিয়া গেলেও হিন্দুধর্ম্ম সমানবলে পৃথিবীকে শাসন করিবে।

রামকৃষ্ণ বলিতেন, ভগবানের লীলা ধরিয়া ভগবানে পঁহুছিতে হইবে। ইহার অর্থ তন্ন তন্ন বিচার। যেমন পিঁয়াজের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে আর কিছুই থাকে না সেইরূপ এই জগতের ঘটনা সকল বিশ্লেষণ করিতে করিতে এক অনাদি অনন্ত শূন্যধামে পড়িতে হয়—সেই যে শূন্য বাস্তবিক শূন্য নহে। মানব বুদ্ধি মানবশক্তি সেখানে আর কিছু পায় না।

বিশুর জীবনের প্রথমাংশ পাওয়া যায় না। আরও কেহ কেহ লেখাপড়া না শিখিয়া কোন কোন জন পদের উপকার করিয়াছেন—কিন্তু ইহাদের মতন নহে।



সেই মহাশূন্য যে চৈতন্য বস্তু মানুষ সমাধিতে নিমগ্ন হইলে বুঝিতে পারে। যেখানে কিছুই নাই—অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল জগতের কিছুই নাই—যাহা আছে তাহা ইন্দ্রিয়াতীত—এইজন্য তাহাকে শূন্য বল অবস্তু বল কিন্তু বাস্তবিক অবস্তু নহে। অবস্তু হইতে বস্তু সম্ভবে না। যেমন ছোট বলিলে বড় কি অমনি জানা হয়, শীতল বলিলে গরম কি অমনি জানা হয়, আলোক বলিলে অন্ধকার কি অমনি জানা যায়, সেইরূপ বস্তু বলিলে অবস্তুর জ্ঞান আপনি উঠে। কিন্তু যেমন আলোক ও অন্ধকার একই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা অর্থাৎ অল্প আলোকই অন্ধকার; অল্প উত্তাপই শীতলতা; সেইরূপ বস্তুর অল্প প্রকাশই অবস্তু। ব্রহ্মাণ্ডের অপ্রকাশিত অবস্থাই অবস্তুর ভাব মহাশূন্যের ভাব। ঘণ্টার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে আর নাই—কিন্তু বাস্তবিক কি নাই? আছে—কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায়। এই অবস্থাটা ঘণ্টারধ্বনির নির্ব্বাণ। এই জগৎ এখন ঘণ্টারধ্বনির ন্যায় আছে—এক সময়ে থাকিবে না অদৃশ্য হইবে মহাশূন্যে মিশিবে।

রামকৃষ্ণ ভগবানের লীলা ধরিয়া বিচার করিলেন—বিচারের শেষে পঁহুছিলেন; দেখিলেন জগতে যাহা কিছু হইতেছে, সবই ভগবান করিতেছেন। তিনি চোরকে চুরি করিতে বলিতেছেন, গৃহস্থকে সতর্ক হইতে বলিতেছেন, পুলিসকে চোর ধরিতে বলিতেছেন, হাকিমকে সাজাদিতে বলিতেছেন। রামকৃষ্ণের এই জ্ঞান স্বাভাবিকী বিচারশক্তির ফল। উরোপের দার্শনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে বিষয় লইয়া এখনও মাথাকুটিতে-ছেন—রামকৃষ্ণ স্বাভাবিকী শক্তিবলে এমন সূক্ষ্ম বিচার করিলেন

যে তাহা শেষ আদালতের রায়ের সহিত মিলিয়া গেল। রামকৃষ্ণ তাই জোরে কহিলেন,

"সাপ হয়ে খাই আমি রোজা হয়ে ঝাড়ি।
হাকিম হয়ে হুকুম দি পেয়াদা হয়ে মারি॥"

ইহা অপেক্ষা সুন্দর মীমাংসা আর হয় না।

রামকৃষ্ণ একদিন সংসারের বিশ্লেষণে বসিলেন। কামিনী ও কাঞ্চনের শক্তিই সংসারের দুই মহাশক্তি। অবিদ্যার এই দুই মোহিনীমায়ায় সংসার চলিতেছে। কামিনী হইতে সন্তানাদি হইয়া কুটুম্ব বৃদ্ধি হয়—মায়ার বড় বড় শিকল মানুষকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলে। লণ্ঠনের আলো দেখিয়া যেমন রাশি রাশি পতঙ্গ কীট সেই দিকে ছুটে—আলোকে পড়িয়া মরে; মানুষের দলও (ততোধিক) কামিনীর রূপের আলো দেখিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাতে ধাবিত হয়; কত বিষয় সম্পত্তি আহুতি দেয়; অবশেষে আপনার প্রাণ শেষ করে। শ্মশানের আগুণ মৃতদেহকে পোড়ায় আর রমণীর আগুণ জীবিত দেহকে ভস্ম করে।

রামকৃষ্ণ আপনার মনকে বলিলেন মন! কামিনীর রূপ কোথায়? অনুবীক্ষণ দিয়া যদি দেখ তো অবাক হইবে—বিচার চক্ষে দেখ আরো অবাক হইবে। শরীরের উপরে একখানা পালিস করা চামড়া। তার ভিতরে রক্ত, বসা, গু, মুত। দুটা নাকের ছিদ্র দুটা শ্লেষ্মার নর্দ্দামা। দুটা চক্ষু দুদা পিঁচুটীর গর্ত্ত। মুখের ভিতরদিয়া যখন নিদ্রাকালে লাল ঝরে তখন দুর্গন্ধে টেকাদায়। প্রস্রাব ও বিষ্ঠার দুটা নর্দ্দামা আছে—আর যে জিনিসের জন্য মানুষ—ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত,

মূর্খ সমভাবে উন্মত্ত—তাহা অপেক্ষা দুর্গন্ধযুক্ত স্থল আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। মন! তুমি কি রমণীতে উন্মত্ত হবে? মস্তিক দুর্ব্বল হইবে, শরীর অসুস্থ হইবে—অকালে প্রাণ হারাইবে। মন! তুমি যদি রমণী ত্যাগকর তো সচ্চিদানন্দ বস্তু পাইবে। যে বস্তুর এক বিন্দু লাভ হইলে মানুষের কোটী সুন্দরীর রমণের সুখ অতি তুচ্ছ হইয়া যায়। যাঁকে একবার দেখিবা মাত্র নারদ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উন্মত্তবৎ ত্রিভূবন ভ্রমণ করিয়াও ক্লান্ত হইলেন না। মন! তুমি সেই সচ্চিদানন্দ বস্তু লবে না অসার কামিনী লইবে?

রামকৃষ্ণ একদিন একহাতে মাটী ধরিলেন আর অন্য হাতে টাকা ধরিলেন। বলিলেন "মন! ইহার নাম টাকা আর ইহার নাম মাটি। টাকা রূপার চাকতি—ইহাতে বিবির মুখ আছে। ইহা জড় পদার্থ। ইহাতে চাউল—দাউল—মেলে, দশ জনকে ইহাদ্বারা ভরণপোষণ করা চলে। তীর্থভ্রমণ, সাধুসেবা, এবং দশজনের উপকারও ইহাদ্বারা হইয়া থাকে—কিন্তু সচ্চিদানন্দ লাভ ইহাদ্বারা হয় না। না হইবার কারণ এই যে, টাকায় মনে বড় অহংকার আসে, এবং নানাবিধ আসক্তি ইহা হইতে উৎপন্ন হয়। যদিও সামান্য উপকার ইহাতে হয়—ঈশ্বর প্রার্থীর পক্ষে ইহা বিষ সদৃশ। ইহা রজঃ ও তমো ভাবের জনক—এইজন্য ইহাতে—সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। মন! ইহাতে অল্প পুণ্য হয় অধিক পাপ হয়। অতএব ইহার প্রয়োজন নাই।

তার পর অপর হস্তের মাটীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "মন! ইহার নাম মাটী। ইহাও জড়পদার্থ। ইহাতে শস্য হয়—

সেই শস্যে দেহ রক্ষা হয়। ইহাতে গৃহাদি প্রস্তুত হয় এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠিত হয়। টাকায় যা হয় মাটীতেও তা হয়। দুই এক বস্তু—দুই এর পরিণাম এক। মন! তুমি ইহাদের লইয়া থাকিবে না সচ্চিদানন্দের চেষ্টা করিবে? তারপর দুই চক্ষু মুদিয়া বলিতে লাগিলেন "টাকা মাটী—মাটী টাকা—টাকা মাটী—মাটী টাকা"—রামকৃষ্ণ কর কি? গঙ্গারতীরে দিনেরবেলা পাগলের মত কি করিতেছ?—ঐ দেখ লোকে তোমায় পাগল বলিয়া চলিয়া গেল। আজ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দিনে মানুষে যে টাকাকে ভগবান ভাবিয়া পাগল হইয়াছে—তুমি ও কি বলিতেছ! লোকে তোমায় পাগল বলুক—তাহারাই পাগল। তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ সন্তান। তোমার মত ব্রাহ্মণ এখনও আছেন বলিয়াই আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে।

টাকা মাটী মাটী টাকা—এ কথাটা একবার ঐহিক চিন্তা-ভিভূত উরোপ ও আমেরিকার কর্ণকুহরে ভাল করিয়া শুনাও। তোমার বিবেকানন্দ দ্বারা বজ্র গম্ভীরস্বরে শুনাও।

টাকা মাটী মাটী টাকা—এই অমৃতবাক্য বর্ত্তমান লঘুচেতা অর্থপিশাচ ধনী সম্প্রদায়ের কর্ণকুহরে ভাল করিয়া শুনাও।

টাকা মাটী মাটী টাকা—ব্রাহ্মণ জাতির মজ্জাগত এই প্রাচীন ভাবটী একবার বর্ত্তমান অধঃপতিত অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণ উপাধিধারি মানবদিগের বধিরকর্ণে ভাল করিয়া শুনাও।

"টাকা মাটী মাটী টাকা"—এইটী রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্ম্ম জীবনের প্রধানতম ভাব। যাহার দিকে রামকৃষ্ণ কৃপা নয়নে চাহিয়াছেন—সেই দৃষ্টির ভিতর দিয়া এই ভাবটী

বিদ্যুতের ন্যায় তাহার অন্তরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। রামকৃষ্ণের শিষ্যগণ আপনাদের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পৃথিবীকে শিখাইতেছেন।

"টাকা মাটী—মাটী টাকা" চক্ষু মুদিয়া বিচার করিতে করিতে ঝুপ করিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়াদিলেন।

দুই একজন পাগল বলিতে বলিতে চলিয়াগেল। দক্ষিণেশ্বর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রচার হইল যে রাসমণির কালী বাড়িতে একটা পাগল আছে সে টাকা জলে ফেলিয়া দেয়।

রামকৃষ্ণ তখনও জহরি কেশবের চক্ষে পড়েন নাই। কেশব তুমি ধন্য! তুমি যদি রামকৃষ্ণ রত্ন না চিনিতে তো আজ পৃথিবী ও রত্নজ্যোতি হইতে বঞ্চিত হইত।

রামকৃষ্ণের কালী দর্শন।

রামকৃষ্ণ যত সাধনার উচ্চমার্গে উঠিতে লাগিলেন ততই পূজার নিয়মপদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া আপনার অভিরুচি অনুসারে পূজা করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ যখন কালীর সম্মুখে বসিয়া হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসে অধীর হইতেন তখন পূজার মন্ত্র তন্ত্র ভুলিয়া বালকের ন্যায় সরল ভাষায় কাঁদিতে কাঁদিতে মার পূজা করিতেন। রামকৃষ্ণ একদিন মার সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন। "মা! আমি মান চাই না ধন চাই না। লোকে গনুক মানুক—এ সব চাই না। মা! তুমি আমায়

দেখা দাও। মা। আমি অষ্ট সিদ্ধিই চাই না মা! মা! তুমি আমায় দেখা দাও। মা! তুমি রামপ্রসাদকে দেখা দিলে, কমলাকান্তকে দেখা দিলে মা। আমায় কি দেখা দেবে না। মা। আমায় দীনের দীন, হীনের হীন কর, হাড়ি চণ্ডাল অপেক্ষা বিষ্ঠার কৃমি অপেক্ষা নীচ কর। মা! আমায় দেখা দাও।” একদিন রামকৃষ্ণ মার কাছে এইরূপে কাঁদিতে লাগিলেন। সে কান্না শুনিয়া পাষাণ গলিয়া যায়। মন্দিরের ভিতরে বা বাহিরে দাঁড়াইয়া যে সে কান্না শুনিয়াছে সে ধর্ম্মভাবে গলিয়া গিয়াছে—নবজীবন লাভ করিয়াছে।

কাঁদিতে কাঁদিতে রামকৃষ্ণের দুচক্ষু লাল হইল। দুচক্ষুর জলে রামকৃষ্ণ ভাসিতে ভাসিতে বাক্যহীন হইলেন। রামকৃষ্ণ কাতরতায় নীরব হইলেন। এইরূপে যখন মন প্রাণ অস্থিমজ্জা মার জন্য কাঁদিতে লাগিল তখন মা আর থাকিতে পারিলেন না। মা রামকৃষ্ণকে দেখা দিলেন। কিন্তু দেখা দিয়াই আবার লুকাইলেন। রামকৃষ্ণ তখন আরো অস্থির হইলেন। মার সে চিৎঘন মূর্ত্তি দেখিয়া রামকৃষ্ণের প্রাণ পাগল হইল রামকৃষ্ণ মন্দির হইতে স্ববাসে গেলেন। কিন্তু আর কাহারে সহিত কথা কহেন না—কেবল দুচক্ষু মুদিয়া মাতৃহারা শিশুর ন্যায় মা! মা! করিয়া রোদন করেন। আহারে প্রবৃত্তি নাই—না খাওয়াইয়া দিলে খাননা—খাইতে পারেন না রাত্রে ঘুম নাই—কেবল সমস্ত রাত্রি মা! মা! করিয়া কাঁদেন। মার সেই রূপের কথা মনে পড়ে আর অমনি পাগল হইয়া পড়েন সংজ্ঞাহীন হইয়া শুইয়া থাকেন। কখনও, “প্রাণ যা মা —দেখা দিলি তো লুকালি কেন?”

কখনও "বিষ খাইব না জলে ডুবিব, তোমরা আমার মাকে আনিয়া দাও" বলিতে বলিতে মৃতবৎ হইয়া পড়েন।

রামকৃষ্ণের চক্ষের জল দেখিয়া লোকে অবাক হইল. এত জল কোথা হইতে আসে। রামকৃষ্ণ সেই চক্ষের জলে যে পৃথিবীর পাপ ধৌত করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই বিরহ অবস্থায় যাতনায় রামকৃষ্ণ ছয়মাস কাটাইলেন। রামকৃষ্ণের দেহে হাড় দেখা গেল—রামকৃষ্ণ মার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকাইয়া গেলেন।

মা আর অধিক দিন অদৃশ্য থাকেন নাই। মা নাকি রামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন "বাছা আর তোকে কষ্ট দেব না। এবার হতে যখনি ডাকিবি দেখা পাবি।"



কালী কি ?



রামপ্রসাদ বলিয়াছেন ;—

কে জানে গো কালী কেমন ?
ষড় দর্শনে না পায় দরশন।

অর্থাৎ দার্শনিকের আলোচনা দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

"প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে
সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা
ধর্ব্বে শশী হ'য়ে বামন।"

তিনি প্রাণের প্রাণ—সুতরাং প্রাণদ্বারা প্রাণকে বুঝা যায় বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায় না।

রামকৃষ্ণ কালীমার সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু বিশেষের কাছে * যাহা কহিতেন সেই বন্ধুটীও সাধনাবলে কালীকে সেই ভাবেই উপলব্ধি করিতেছেন। সে ভাবটী এই।

কালবর্ণ কি ? না যেখানে কোন বর্ণ নাই তাহাই কাল বর্ণ। যেখানে আর কিছুই নাই—অর্থাৎ গুণাতীত যে বস্তু তিনিই কাল বা মহাকাল। আর সেই মহাকালের যাহা শক্তি বা গুণ তাহাই কালী। মহাকালের উপরে কালী। কালী

---

* কলিকাতা অঞ্চলের তান্ত্রিকদিগের নেতা নুকুলাবধূত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

ব্যতীত মহাকাল মৃত—শব—কার্য্য করিতে অক্ষম। কালীকে বুকে করিয়া ইনি সর্ব্বশক্তিশালী। এই মহাশক্তি দ্বারা জগৎ প্রকাশের পূর্ব্বাবস্থা যাহা (অর্থাৎ জগৎ প্রকাশের সূচনা মাত্র হইয়াছে এখনও প্রকাশ হয় নাই) তাহাই শ্যাম বা শ্যামা। বৈষ্ণবের শ্যাম শাক্তের শ্যামা। যেমন দিন হয় নাই কিন্তু হয় হয় এমন যে সময় তাহাই ভোরবেলা। তখন রাত্রি নাই—সূর্য্যও উঠে নাই এই যে অবস্থা তাহাই ভোর—(dawn) সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি জ্যোতিঃ ফুটে ফুটে এখনও ফুটে নাই সেই যে অবস্থা তাহাকেই শ্যাম বা শ্যামা বলা হইয়াছে। সেই শ্যামা-মার গর্ভে জড় জগৎ তখন গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় অবস্থিতি—তখন মহাপ্রকৃতির রূপের একটী মাতৃভাব উপস্থিত—কেন না, তখন তিনি গর্ভবতী—সমস্ত জগৎ তাঁর গর্ভে—মহাশক্তির তখন যে রূপ তাহাকে শ্যামরূপ বলা হইয়াছে। সাধক যখন সেই মহাশক্তির সৃষ্টিপূর্ব্বকালীন মূর্ত্তি দেখেন সেই মূর্ত্তিই শ্যামামূর্ত্তি। এই শ্যামাই শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধকালে কালীমূর্ত্তি ধারণ করেন। যখন যা মূর্ত্তি মা ধরিয়াছেন প্রকৃতিতে তার ছবি আছে—ছায়া আছে। প্রথমে ছায়া ধরিতে হয়—তারপর কায়া পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টানেরা বলিয়া থাকেন "dawn of uncreated light।" এই যে dawn ইহা চৈতন্যরূপিনী—ইনিই শ্যাম বা শ্যামা।

সমুদ্র-ভিতরে যে অন্ধকার, হিমালয়ের কঠিন প্রস্তর ভিতরে যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার যে অন্ধকারকে অবলম্বন করিয়া আছে তাহার যে বর্ণ মা কালীর সেই বর্ণ—সেই যে আঁধার তাহাই সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন শ্যাম বা শ্যামামূর্ত্তি। সমস্ত

জগতের অভ্যন্তরে ঘনীভূত আঁধার রাশি—এই ঘনীভূত আঁধারের মূলে যিনি তিনিই কালী বা মহাকালী।

অভিমান নাশ।

পূর্ব্বোক্ত অবস্থা লাভের পর রামকৃষ্ণ প্রকৃত সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। যদি সিদ্ধ হইলেন তো আবার সাধনা কেন? জগৎকে শিখাইবার জন্য। অনেক মহাত্মা কেবলমাত্র মানব জাতির উপকারের জন্য আপন ইচ্ছায় দেহ ধারণ করেন। ইহাঁরাই নিত্য সিদ্ধরূপে কথিত হন। ইহাঁদের জীবনে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পূর্ব্ব জন্মের উপার্জ্জিত সিদ্ধাবস্থা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। মানবজীবনে এই যে সব জ্ঞান ভক্তি প্রেমের স্বাভাবিক প্রকাশ ইহা যে ব্যক্তি দেখিয়াছে সে আশ্চর্য্য হইয়াছে। মানুষ লেখাপড়া শিখিল না, উপদেশ পাইল না, কিন্তু এমন সব উচ্চ জ্ঞানের কথা কহিতে লাগিল যে বড় বড় শাস্ত্রকে যেন খাট করিয়া ফেলিল। রামকৃষ্ণ পরমহংস পৃথিবীকে শিক্ষা দিবার জন্য কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে অভিমান নাশের পন্থা দেখাইবার জন্য মার কাছে বসিয়া রোদন করিলেন "মা আমার অহং নাশ কর। তুমি তথায় প্রকাশ থাক। জগতে সব পদার্থ অপেক্ষা আমি নীচ, এই বোধ প্রবল করিয়া দাও। আমাকে দীনের দীন, হীনের হীন কর। হাড়ি মুচি চণ্ডাল মেথর অপেক্ষা আমায় হীন করিয়া দাও। বিষ্ঠার কৃমি আমা অপেক্ষা বড়—আমি সবার,

নীচ, এ বোধ আমার প্রবল কর।" শুধু কথায় বলিয়া নিরস্ত হইলেন না। ঝাঁটা মুখে ধরিয়া মানুষের গু, মুত পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। মেথরদিগের বিষ্ঠার ভার স্কন্ধে লইয়া মেথরদিগের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখন বিষ্ঠা লইয়া গায়ে মাখেন। কখনও বিষ্ঠা জিহ্বায় দিয়া সমাধিতে ডুবিয়া যান।

রামকৃষ্ণ যখন এইভাবে সাধন করিতেছিলেন তখন কালী বাড়ির অনেকেই তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। কোন কোন আত্মীয় রামকৃষ্ণকে ও পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য নির্জ্জনে কত উপদেশ দেন—কখনও ভর্ৎসনা করেন। রামকৃষ্ণ কাহারও কথা শুনেন না। আপনার মনে যাহা ভাল বলিয়া বুঝেন তাহাই করেন। রামকৃষ্ণ বলিতেন :—

লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। কার্য্যে রামকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি আরো কহিতেন ভগবানকে যাহারা চায় তাহাদের লোকের কথাকে (উপহাস ঠাট্টা বিদ্রূপকে) কাকের কোলাহলের ন্যায় ভাবিতে হবে নহিলে পারিবে না। তিনি কাহারো কথায় গ্রাহ্য না করিয়া কালীমার হুকুম অনুসারে সব করিতে থাকিলেন।

একদিন রামকৃষ্ণের বিশেষ আত্মীয় বৈদান্তিক হলধারী গোপনে রামকৃষ্ণকে কহিলেন "রাম! তুমি যে কালী দেখার কথা বল ও তোমার কল্পনা মাত্র। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে এই জন্য তুমি নানাবিধ দেবমূর্ত্তি দেখ—এ সব মস্তিষ্কের বিকার। তুমি ও সব পরিত্যাগ কর। "ভগবানের আকৃতি নাই।" এইরূপে মহাপণ্ডিত হল-

ধারী রামকৃষ্ণকে মাঝে মাঝে অনেক কথা বলিতেন। একদিন রামকৃষ্ণ তাঁর কালীমাকে ডাকিলেন। মা অমনি প্রকাশিত হইলেন। তখন রামকৃষ্ণ মাকে নিবেদন করিলেন "হাঁ মা! হলধারী বলে আমার মাথা খারাপ হইয়াছে তাই সব খেয়াল দেখি। মা! বলে দে আমার কি হ'ল।" মা বলিলেন "বাবা! তুমি যেমন আছ তেমনি থাক।" রামকৃষ্ণের মন স্থির হইল। আবার একদিন হলধারী আসিয়া যখন সেই সব অন্যায় কথা আরম্ভ করিল, তখন রামকৃষ্ণ কহিলেন হলধারি! তোমার কথা আর শুনিব না। মা বলিয়াছেন ও খেয়াল নহে—যাহা দেখি সব সত্যই দেখি।

এরূপ ভাবে এরূপ স্বরে ঐ কথাগুলি উচ্চারিত হইল যে, হলধারী চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। হলধারীর আর উত্তর দিবার ক্ষমতা হইল না।

রামকৃষ্ণের গুরুলাভ।

একদিন রামকৃষ্ণ আপনার কুটীর মধ্যে বসিয়া মার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে মা কহিলেন, "রামকৃষ্ণ! তোর তো যা হবার সবই হয়েছে। এখন বাবা! একটা যে কাণে মন্ত্র নিতে হবে।" রামকৃষ্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "মা! আমি আর কাকেও জানি না। তুমিই আমার গুরু। যদি মন্ত্র দেওয়াতে হয় এইখানেই আমার কাণে মন্ত্র দেওয়াও। আমি তোমার কাছ ছেড়ে কোথাও যাব না।"

রামকৃষ্ণ গুরু লাভের জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না। যার ভগবৎ পিপাসা খুব প্রবল তার গুরু তার কাছে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাকে আর গুরু খুঁজিতে হয় না।

তোতাপুরি নামক একজন মহাপুরুষ রেল গাড়িতে কলিকাতা যাইতেছিলেন। ভ্রম বশতঃ ইনি হাবড়ায় না নামিয়া বালীর ষ্টেসনে নামিলেন। নামিয়া শুনিলেন এখান হইতে কলিকাতা অনেক দূর। তোতাপুরি গঙ্গার ঘাটে গিয়া একখানি পান্সি ভাড়া করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। রামকৃষ্ণ গঙ্গার ঘাটে কাপড় কাচিতেছেন। তোতাপুরির পান্সি গঙ্গার মাঝখানদিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একটী ঘূর্ণি বায়ু উঠিল। সেই বায়ুর আঘাতে পান্সিখানা ধাঁ করিয়া রাসমণির কালী বাড়ির ঘাটে আসিয়া লাগিল। রামকৃষ্ণ আপনভাবে বিভোর হইয়া কাপড় কাচিতেছিলেন। পান্সির দিকে বড় নজর করিলেন না। তোতাপুরি সম্মুখে প্রকাণ্ড দেবালয় দেখিয়া আনন্দিত প্রাণে নৌকা হইতে নামিলেন। সেই রাত্রি দেবালয়ে অতিবাহিত করিবার জন্য অতিথি শালায় গিয়া আশ্রয় লইলেন।

তোতাপুরি বৈদান্তিক—ঘোর মায়াবাদী। সাকার উপাসনা মানেন না। কুম্ভকযোগে মহা সিদ্ধ। ইনি নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা লাভ করিয়াছেন। তোতাপুরির আকৃতি দেখিয়া মন্দিরের পাণ্ডারা অসাধারণ পুরুষ জ্ঞানে একটী স্বতন্ত্র গৃহে থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তোতাপুরি আহারাদি সমস্ত করিয়া রাত্রে সেই ঘরে শয়ন করিলেন।

রামকৃষ্ণ এ সব কিছুই জানেন না। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহরের অধিক, তখন রামকৃষ্ণ প্রত্যাদিষ্ট হইলেন "অমুক ঘরে তোর গুরু আসিয়াছেন। তাঁর নাম তোতাপুরি। তিনি গঙ্গাসাগর যাত্রী। আমি তোর জন্য তাঁকে পথ ভুলাইয়া ঘূর্ণি বায়ু তুলিয়া এখানে আনিয়াছি। হাবড়ায় না নামাইয়া বালীতে নামাইয়াছি। পান্‌সি করিয়া এখানে আনিয়াছি। তুই এইবেলা তাঁর কাছে যা। তিনি তোর কাণে মন্ত্র দেবেন।" মার মুখে এই সব কথা শুনিবামাত্র রামকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি উঠিলেন। বালকের মত ভোঁ করিয়া দৌড় দিলেন। সেই ঘরের কাছে গিয়া দ্বারে ধাক্কা মারিতে লাগিলেন। দরজায় ধাক্কা শুনিয়া তোতাপুরি "কোন হ্যায় ?"

রাম। আমি।

তো। তোম কোন হ্যায় ?

রাম। আমি রামকৃষ্ণ।

তো। রাতমে হামরা পাশ ক্যা মাঙতা ?

রাম। মা আমার পাঠায়েছেন।

তো। মা কোন হ্যা ?. তেরা মাকোতো হাম জানতা নাহি।

রাম। মা বল্লেন আপনার নাম তোতাপুরি। আপনি গঙ্গাসাগরের যাত্রী। ভুলে বালিতে নেমেছেন। পান্‌সি করে আপনি কলিকাতায় যাইতেছিলেন। মা ঘুর্ণি বায়ুতে করিয়া আপনার পান্‌সিকে এই বাঁধা ঘাটে লাগয়ে দেন। মা বল্লেন আপনি আমার গুরু। মা আমায় আপনার কাছে পাঠায়েছেন।

কথাগুলা শুনিয়া তোতাপুরি অবাক হইলেন। দরজা খুলিয়া দিলেন।

রামকৃষ্ণ তোতাপুরিকে প্রণাম করিলেন। তোতাপুরি কিয়ৎক্ষণ পরে "কাল গঙ্গায় মন্ত্র দেব" বলিয়া রামকৃষ্ণকে বিদায় দিলেন।

তোতাপুরি রামকৃষ্ণকে পরদিবস সকালে গঙ্গার গর্ভে মন্ত্র দিলেন। রামকৃষ্ণকে কুম্ভকযোগ শিখাইলেন। রামকৃষ্ণ তিন দিনে তাহাতে সিদ্ধ হইলেন দেখিয়া তোতাপুরি আশ্চর্য্য হইলেন। সূর্য্যকে পশ্চিম দিকে উঠিতে দেখিলে যেমন অবাক হইতেন রামকৃষ্ণের কুম্ভকযোগে সিদ্ধিলাভ তিন দিনে ঘটিল দেখিয়া সেইরূপ অবাক হইলেন। তোতাপুরি ভাবিতে লাগিলেন রামকৃষ্ণ মানুষ বলিয়া বোধ হয় না—অথবা পূর্ব্বজন্মে সবই হইয়াছিল—এ জন্মে একটু প্রয়াসেই ফুটিয়া গেল। এই কুম্ভকযোগে সিদ্ধিলাভ হইতে তোতাপুরির বিয়াল্লিশ বৎসর লাগিয়া ছিল। কোথায় বিয়াল্লিশ বৎসর আর কোথায় তিন দিন। রামকৃষ্ণ মানুষ কি ভগবান তা উচ্চ যোগীরাই বলিতে পারেন।

তোতাপুরি গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিয়া রামকৃষ্ণের কাছে কয়েকমাস অবস্থিতি করিলেন। এই অবস্থিতি সময়ে তোতাপুরির সহিত রামকৃষ্ণের নানা বিষয়ে আলোচনা হইত। তোতাপুরি নানা শাস্ত্রপাঠে কঠোর সাধনায় যে সব বিষয় বুঝিয়াছিলেন—রামকৃষ্ণ লেখাপড়া না শিখিয়া সেই সব বিষয়ের সরল মীমাংসা কি প্রকারে করেন ইহা ভাবিয়া অবাক হইতেন। তোতাপুরির সহিত রামকৃষ্ণের কোন কোন বিষয়ে

মিশিত না। রামকৃষ্ণ কথায় কথায় মা, মা, কহিতেন। এক দিন তোতাপুরি রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা! তুমি 'মা' বল কাকে? মা আবার কি?"

রামকৃষ্ণ কোন উত্তর করিলেন না। আপন গৃহে গিয়া ধ্যানস্থ হইয়া মাকে নিবেদন করিলেন। "মা আমার গুরুকি তোকে জানেনা? গুরু বলেন মা আবার কি? গুরুকে কি বলবো বলে দাও মা?"

মা কহিলেন "তোর গুরুকে আজ রাত্রি দুটার সময় আমার মন্দিরের পিছনে যাইতে বলিস; আমি তোর কি প্রকার মা বুঝিতে পারিবে।"

রামকৃষ্ণ অমনি গুরুর নিকটে গিয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন গুরু বলিলেন "আচ্ছা বাবা! আজ রাত্রে আমি যাব।

তোতা পুরি সেই রাত্রে ঠিক দুটার সময় খড়ম পায়ে কালী মন্দিরের পিছনে চলিলেন। তখন আকাশের চাঁদ অস্ত গিয়াছে। মন্দিরের পিছনে বৃক্ষসকলের ছায়ায় অন্ধকার বড় ঘন হইয়াছে। তোতা পুরি ধীরে ধীরে যাইতে ছিলেন হঠাৎ পায়ে কিসের আঘাত লাগিল। পা হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল—হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন — একবারে অজ্ঞানবৎ ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া গেলেন। জীবনে কখনও এমন হোঁচট খান নাই।

রামকৃষ্ণ আপন ঘর হইতে যোগ শক্তির বলে এই ঘটনা জানিতে পারিয়া দ্রুত বেগে গুরুর কাছে ধাবিত হইলেন মন্দিরের পিছনে গিয়া "বাবা। পড়ে গেছ?"

"হাঁ বাবা আমার আর উঠিবার শক্তি নাই। তোমার মা আমায় ফেলিয়া দিয়াছেন। আমার বোধ হয় শরীরের হাড় চূর্ণ হইয়াছে। আমি উঠিতে পারিতেছি না—বাবা তোমার মাকে বলে আমায় ভাল কোরে দাও। তোতা পুরি অতি কাতর স্বরে এই কথা কহিলে রামকৃষ্ণ বালকের মত কাঁদিয়া মাকে ডাকিতে ডাকিতে কহিলেন "মা। ওমা। আমার গুরুকে ফেলে দিলি কেন মা। আমার গুরুকে ভাল করে দেনা মা"। রামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন সে কান্না শুনিয়া তোতা-পুরির প্রাণের ভিতরে এক আশ্চর্য্য ভক্তি ভাবের উদয় হইল। তোতা পুরি জ্ঞান চক্ষে দেখিলেন "সচ্চিদানন্দ যিনি তিনি অবিকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন"। অমনি সব যাতনা দূর হইল। তোতাপুরি উঠিলেন। রামকৃষ্ণের পৃষ্ঠে মৃদুভাবে চাপড় মারিতে মারিতে কহিলেন ' বাবা! আমি তোর গুরুনই তুই আমার গুরু বাবা! তোর মা যে কেমন মা তা বুঝিয়াছি আজ আমার শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান সরস হইল"।

রাম কৃষ্ণের নানা মতের সাধনা।

সিদ্ধ দিগের মধ্যে নানা ভাবের সিদ্ধ আছেন। কেহ বাক-সিদ্ধ-যাহা মুখে বলেন তাহাই ফলে। কেহ পিশাচ সিদ্ধ তোমাকে পিশাচ দেখাইতে পারে: ভূত প্রেতের সাহায্যে নানাবিধ কার্য করিতে পারে। ইহারা শক্তি সিদ্ধ: ইহাঁরা নানাবিধ শক্তি

দেখাইয়া মানুষকে আকৃষ্ট করেন। ইঁহারা কোন শক্তি লাভ করিয়াছেন বটে কিন্তু এই শক্তি লাভের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই। যাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী প্রকৃত সাধু তাঁহারা শক্তি লইয়া খেলা করেন না। সাধনার পথে শক্তি একটা মহা প্রলোভন। মানুষ বিষয় সম্পত্তির আসক্তি ছাড়িয়া ভগবানের পথে যাইতে যাইতে পরিশেষে এই সব শক্তির প্রলোভন এড়াইতে পারে না। এই শক্তিতে গিয়া ব্রহ্মকে হারাইয়া বসেন। এই জন্য রামকৃষ্ণ বলিতেন, "ক্রমশঃ অগ্রসর হও—সাধনার পথে স্থির থাকা ভাল নয়"। অনেকে তাহা ভুলিয়া একটা মহাশক্তির মায়ায় পড়িয়া আসল জিনিষ হারাইয়া বসেন। মহাভারতে এ বিষয়টী শ্রীকৃষ্ণ বড় সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, দুর্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়েরই আত্মীয়। সুতরাং অপক্ষ পাতিতা অবলম্বন করিয়া কহিলেন "হয় আমাকে লও না হয় আমার অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা লও। কে কি লবে বল?" দুর্য্যোধন অল্পবুদ্ধি ধর্ম্মজ্ঞান বিহীন, তাই বলিলেন "আমি অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা লইব।"

অর্জ্জুন দেখিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া আমি আর কিছুই লইব না সুতরাং অর্জ্জুন কহিলেন "আমি তোমাকে লইব।"

অর্জ্জুন ভগবানের শক্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভগবানকে লইলেন; তাহাতেই অর্জ্জনের জয় হইল—আরভগবানের শক্তির প্রলোভনে পড়িয়া দুর্য্যোধন মারা গেল।

এই ঘটনাটী সাধক দিগের নিকট মহাশিক্ষার স্থল।

অনেক সাধক ভগবানের সম্মুখে গিয়া দুইবস্তু দেখেন ভগবানের শক্তি এবং ভগবান। ভগবান তখন যেন বলেন "আমায় লবে না আমার শক্তিকে লবে।" যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম জড়াইয়া ধরে আর যাহারা বোকা তাহারা তাঁর শক্তিকে ধরে। শেষোক্ত দিগের ঐ খানেই শেষ। ইহারা শক্তি সিদ্ধ হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে থাকে—কিছুদিন পরে অধঃপতন হয় তখন সংজ্ঞাহয় কেন প্রভুকে পাইয়া হারাইলাম।

যাহারা ভগবান পান তাঁহারা তাঁর অসীম শক্তিতে শক্তিশালী হয়েন কিন্তু প্রভুর হুকুম ব্যতীত সে শক্তির চালনা করেন-না, আর যাঁহারা কেবল শক্তি সিদ্ধ তাঁহারা অযথা ভাবে শক্তি চালনা করিয়া পরিশেষে আপনাদের পায়ে আপনারা কুঠারাঘাত করেন।

রামকৃষ্ণ শক্তিসিদ্ধদিগকে ভাল বাসিতেন না। তিনি একটী গল্প বলিতেন। একব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছিলেন। প্রায় ৩০।৩২ বৎসর কঠোর সাধনা করিয়া একটা শক্তি লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি গঙ্গার উপর দিয়া চলিয়া গঙ্গা পার হইতে পারিতেন। এই শক্তি লাভের পর আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। দাদাকে কহিলেন, দাদা! আমি পায়ে করিয়া গঙ্গা পার হইতে পারি—৩২ বৎসর কঠিন সাধনের পর আমি এই বিদ্যা শিখিয়াছি। দাদা হাসিয়া কহিলেন "ছি! ছি! ভাই তুমি ৩২ বৎসর এত মেহনত করিয়া আধপয়সা রোজগার করিয়া আসিলে। আধপয়সা দিলে যাহা করা যায় তার তরে এত কাণ্ড।" সেই সিদ্ধব্যক্তি তখন বড় বিমর্ষ হইলেন। এই শক্তি লাভ করিয়া কেহ বা রোগ আরাম

করিতে থাকেন। অনেক বোকা লোক এই সব সিদ্ধাইদিগের শক্তি দেখিয়া আকৃষ্ট হয় এবং ইহাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ করে।

রামকৃষ্ণ উক্ত প্রকারের সিদ্ধ ছিলেন না। তিনি জ্ঞানে ভক্তিতে সাধুতায় সিদ্ধ ছিলেন। পৃথিবীর যত প্রধান অপ্রধান ধর্ম্ম—সর্ব্বধর্ম্মে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে সাধন করিয়া তাহাতে সিদ্ধ হইলেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ এক আশ্চর্য্য প্রকারে হয়:—

একদিন যদুমল্লিকের বাটীতে গিয়া বৈটকখানায় বসিয়া আছেন। দেওয়ালে একখানা যীশুখ্রীষ্টের ছবি ছিল। রামকৃষ্ণ জানিতেন না কিসের ছবি। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলে যেই শুনিলেন "উনি যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে মরিয়েছেন" অমনি রামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া থাকিলেন—দুইচক্ষু লাল হইল—অশ্রুপূর্ণ হইল—শরীরে রোমাঞ্চ হইল—শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—তার পরই রামকৃষ্ণ মৃতের ন্যায় বসিয়া থাকিলেন। সেই সমাধির অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া রামকৃষ্ণ সেইস্থলে তিনদিন কাটাইলেন। লোকে চৈতন্য সম্পাদনের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই চৈতন্য হইল না। তিন দিন অতীত হইলে রামকৃষ্ণ চক্ষু চাহিলেন—আ! আ! আমি একবারে খ্রীষ্টান হইয়াছিলাম। দুর্গা, কালী প্রভৃতি নাম আমাতে আদতে ছিল না আমি যীশু ভাবিয়া যীশুর ধর্ম্ম কি সব বুঝিলাম।" সে ভাব রামকৃষ্ণের যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা ধন্য। মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন। এই সমাধির অবস্থায় রামকৃষ্ণ ইংলণ্ড ও আমেরিকার

এবং অন্যান্য স্থলের বড় বড় পাদ্রিদের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন—রামকৃষ্ণ পরমহংস এই প্রকার বলিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মের ভাব লাভ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছিলেন। * মিলাইয়া দেখিলেন ধর্ম্মের বহিরাংশ লইয়াই লোকে মারামারি করে। আসল বিষয়ে সব ধর্ম্মেরই এক মত। সকল ধর্ম্মের ভাবই তিন তিনদিন করিয়া সাধন করেন এবং তাহাতেই সিদ্ধ হয়েন। কলিতে মানুষ ষোল আনা প্রাণে সাধন করিলে তিনদিনে সিদ্ধ হইবে, একথা তিনি বার বার বলিতেন।

"রামকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্মে সিদ্ধ", একথা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন যিনি সিদ্ধ তিনি ধর্ম্মের সব বিষয়েই সিদ্ধ। কিন্তু একথা ঠিক নহে। একজন কালী সাধনায় সিদ্ধ। ইনি কালী নামে পাগল হইবেন। কালীর বিষয় সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিবেন। ইনি ভগবানের কালী ভাবই দেখিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণ রাম কি শিব ভাব দেখেন নাই বুঝেন নাই। ইনি শিব কি কৃষ্ণ ভাবের বিষয় ভাল কিছুই জানেন না। হয় তো ঐ সব নামে বিরক্ত—তাঁর কালীই যেন সব, আর সব যেন কিছুই নহে। এ সম্বন্ধে একটী প্রকৃত ঘটনা বলি। "কালনার ভগবান দাস বাবাজি" বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চূড়ামণি ছিলেন। তিনি একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। একথা বঙ্গদেশে

---

* ইনি দেখিলেন হিন্দুর বলিদান এবং মুসলমানের জবাই একই ভাবে উৎপন্ন—দুইএর উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ জীবের সদ্‌গতি ইত্যাদি। সে সব লিখিলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়।

অনেকেই জানেন। ইহাঁর সহিত কোন একজন ভদ্রলোকের আলাপ হইল। ভদ্রলোকের সহিত নানা কথোপকথনের পর শ্রদ্ধাস্পদ বাবাজি মহাশয়, উহাকে কোন এক পরিচিত ব্যক্তির পুত্রাদির কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, উক্ত ব্যক্তির কোন বিদ্বান পুত্রের পরিচয় লইতে লাগিলেন। পরিচয় প্রসঙ্গে যখন শুনিলেন যে তিনি একজন প্রধান বৈদান্তিক—ঘোর মায়াবাদী, তখন একটু আক্ষেপ করিয়া কহিলেন "আহা হা! অমন বৈষ্ণবের বেটা নাস্তিক হয়ে গেল।"

পাঠকগণ! দেখুন একজন কত বড় বৈষ্ণব, একজন মায়াবাদী বৈদান্তিক সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিলেন! আবার এ দিকে দেখুন, রামকৃষ্ণ—একজন মায়াবাদীর নিকট মা কালীর হুকুম শুনিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এ বিষয়টী রামকৃষ্ণ একটী গল্প দ্বারা বেশ বুঝাইতেন। তিনি বলিতেন ঈশ্বর যে সাধকের নিকট যে রূপে দেখা দিয়াছেন সেই সাধক তাঁকে সেইভাবে প্রচার করিয়াছেন।

যেমন একব্যক্তি গিরগিটীর লাল রং দেখিয়া ভাবিল উহার রং বাস্তবিকই লাল। আর একজন সবুজ দেখিয়া ভাবিল, সবুজ আর একজন নীল রং দেখিয়া ভাবিল গিরগিটীর রং নীল।

একস্থানে তিনজনে একত্র হইয়া গিরগিটী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে মহা গণ্ডগোল হইল। এমন সময়ে এক ব্যাধ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ব্যাধ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া কহিল, গিরগিটী সম্বন্ধে আপনারা যে যা বলিতেছেন সবই সত্য, কিন্তু গিরগিটী বহুরূপী। কখনও নীল হয় কখন সবুজ হয়, কখন সাদা হয়। তখন বিবাদ মিটিয়া গেল।

যিনি ভগবানের একটী কোন বিশেষ রূপ দেখিয়াছেন তিনি সেই বিষয়ে সিদ্ধ অর্থাৎ যখনই ভগবানকে ডাকেন ঐ একটী (কালী বা কৃষ্ণ) রূপে ভগবান তাঁর নিকট প্রকাশিত হন। পুনঃ পুনঃ এক প্রকার রূপে ভগবানকে দেখেন বলিয়া তাঁকে তদ্রূপই ভাবেন এবং প্রচার করেন। কিন্তু এমন ভক্ত আছেন যে তিনি ভগবানের বহুরূপ দেখিয়াছেন এবং দেখিয়া থাকেন। এইরূপ ভক্তের সংখ্যা অতি অল্প বটে—কিন্তু ইহাঁরাই অতি উন্নত। রামকৃষ্ণ ভগবানের নানারূপ দেখিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি অন্যান্য সিদ্ধ পুরুষদের উপরে। রামকৃষ্ণ ভগবানের নানারূপ দেখিবার জন্য নানামতে সাধন করেন এবং তিন তিন দিন সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন।



রামাৎমতে সাধনা ও সিদ্ধি।

রামকৃষ্ণ রামাৎমতে সাধনা করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিলেন। হনুমানের মত রামভক্ত আর কে আছে? সেই মহাভক্ত হনুমানের অহৈতুকী ভক্তি পাইবার জন্য রামকৃষ্ণ ব্যাকুল হইলেন। এমন সময়ে কালীবাড়িতে একজন রামাৎ-মতে সিদ্ধ যোগী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই যোগীর নিকট রামকৃষ্ণ রামাৎমতের উপদেশাদি লইয়া সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামকৃষ্ণ হনুমানের নৈষ্ঠিক ভক্তির কথা ভাবিতে লাগিলেন। হনুমান যে দিনে রামকে না দেখিতেন

সে জিনিস লইতেন না। তিনি রাম ভিন্ন জানিতেন না—এই জগৎকে রামময় দেখিতেন। তিনি রামের নবদুর্ব্বাদল শ্যামরূপ ভিন্ন আর কোনরূপ দেখিতেন না। এই নৈষ্ঠিক ভক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে রামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞান হারা হইতেন—আকুল প্রাণে "রঘুজি" "রঘুজি" করিয়া চীৎকার করিতেন। কখনও কখনও "জয়রাম" "জয়রাম" নাদে কালীবাড়ী নিনাদিত করিতেন। বৃক্ষের উপরে উঠিতেন—ডালে বসিয়া "রঘুজি" "রঘুজি" বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। এই প্রকারে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে তিনি আপনাকে হনুমান বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কাপড়ের লাঙ্গুল পরিলেন। কাঁচাফল খাইতে লাগিলেন। এসময়ে তিনি ভাত বেমন খাইতেন না। এই মতের গুরু, রামকৃষ্ণকে একটী পিত্তলের "রামলালা" মূর্ত্তি দিয়া যান। রামকৃষ্ণ এই মূর্ত্তিটীকে বাৎসল্য ভাবে দেখিতেন।

ভক্তির পথে ভগবানের এমন-সব লীলাখেলা আছে জ্ঞানের পথে সে সব নাই। ভক্তি সাধকেরা তাঁহাদের ইষ্টমূর্ত্তিতে এমন সব অত্যাশ্চর্য্য ভাবের প্রকাশ দেখেন যে সাধারণ বুদ্ধি লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না। আকাশে যে বিদ্যুৎখেলে চাষা তাহা বুঝে না—চাষা দেখিয়া অবাক হয়। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একটী বাবু কোন চাষা পল্লিতে যান। এক চাষার বাড়ি অতিথি হন। বাবুর একটী টেকঘড়ি ছিল। একজন চাষা সেই ঘড়ির ভিতরে টুক্ টুক্ শব্দ হইতেছে শুনিতে শুনিতে ভাবিল, ইহার ভিতরে কোন জন্তু প্রবেশ করিয়া টুক্‌টুক্ করিতেছে। এই ভাবিয়া চাষা, বাবুকে কহিল 'মহাশয়! আপনার এইটার ভিতরে কি শব্দ করিতেছে? বাবু ঘড়িটী খুলিয়া

সেই কল ঘরটী চাষাকে ভাল করিয়া দেখিতে দিলেন। কল ঘরের মধ্যে সেই ছোট পেণ্ডুলেমটীকে পোকা ভাবিয়া চাষা আঙুলে ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে ঘড়ীর কল খারাপ করিয়া ফেলিল। বাবু ঘড়ীর দুর্দ্দশা দেখিয়া রাগান্বিত হইলেন্ না। চাষাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন; এটা পোকা নহে—লোহার কাঁটা স্প্রিং এর জোরে নড়িতেছে। চাষা তাহা আদতে বিশ্বাস করিতে পারিলনা—তাহার বুদ্ধিতে সে কথা বুঝিবার শক্তি নাই।

সাধন রাজ্যে এমন সব ঘটনা আছে যাহা আমরা সামান্য বুদ্ধিতে আদতে বুঝিতে পারি না। বুঝিতে না পারিবারই কথা—অনন্তস্বরূপ ভগবানের এই অনন্ত লীলার মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—কীটস্য কীট—আমরা বুঝিব কি? চর্ম্মচক্ষে যতটুকু দেখি চর্ম্মকর্ণে যতটুকু শুনি। ইহাতেও অনেক ভুল হয়। চর্ম্মচক্ষে দেখিতেছি ঐ আকাশ ঐ মাটীতে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে;—ইহা কি সত্য? কর্ণে শুনিতেছি ঐ বকুলের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিতেছে—কু—কু—কু। কোকিল বাস্তবিক কি কু কু ডাকিতেছে? এজগতের আমরা একটী বালুকণা বুঝিতে পারি না—তবে এ বুদ্ধিতে কি বুঝিব? মানুষ জীবনে যাহা অনুভব করে তাহা তাহার নিকট সত্য—সমস্ত জগৎ মাথা নাড়িয়া "না" বলিলেও তাহার কাছে সত্য। "পৃথিবী ঘোরে,"—ইহা বিচারশক্তির অনেক গম্ভীর পরিচালনা দ্বারা গ্যালিলিও বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি বিচারালয়ে জেলে যাইবার আজ্ঞা পাইয়াও, জোরে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াইয়া বলিলেন "পৃথিবী ঘোরে।" এ কথা অনেকে এতদিন

পরে স্বীকার করিতেছেন। ভক্তি পথের সাধকেরা যে সব আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন, সে সব তোমার আমার কাছে অসত্য হইতে পারে—কারণ তোমার আমার পরিমিত জ্ঞানে ওসব পাই নাই। কিন্তু যাঁহারা জীবনে ওসব অনুভব করিতেছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রকৃতির এমন একটী স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, যে স্থান আমাদের অনেক দূরে। বর্ত্তমান সময়ের ইংরাজী শিক্ষিতগণ এসব কথা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু যাঁহাদের পুস্তক পাঠে ইঁহাদের শিক্ষা তাঁহারা হাসিয়া উড়াইবেন না। ইংরাজী শিক্ষিতদলের একজন প্রধান নৈয়ায়িক এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন শ্রবণ কর:—"Whatever is known to us, by consciousness is known beyond possibility of question. What one sees or feels, whether bodily or mentally one can not but be sure that one sees or feels. No science is required for the purpose of establishing such truths; no rules of art can render our knowledge of them more certain than it is in itself. (System of Logic by J. S. Mill.)

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের সর্ব্ব প্রধান চিন্তাশীল লেখক এই সব অলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন।

"Deep has been, and is, the significance of miracles, far deeper perhaps than we imagine. Meanwhile the question of questions were: what

specially is a miracle? To that king of siam. an icicle had been a miracle ;"—(Thomas Carlyle.)

"These scientific individuals have been no where but where we also are, have seen some hand breadths deeper than we see into the Deep that is infinite, without bottom as without shore. (Thomas Carlyle.)

পাঠকগণ! এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করি।

রামকৃষ্ণ ভক্তির বাৎসল্যভাবে সেই রাম লালা মূর্ত্তির আরাধনা করিতেন। এই মূর্ত্তিতে ভগবান প্রকাশিত হইয়া বালকের ভাবে নানাবিধ আলাপ করিতেন। কখনও রামকৃষ্ণকে "বাবা! বাবা!" বলিয়া ডাকিতেন। রামকৃষ্ণ ভগবান-মুখনিঃসৃত সেই মোহনাশক মধুরস্বরে আচ্ছন্ন হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন—আপনার প্রাণের মধ্যে সেই বাহিরের মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া আবার সুমধুরস্বরে ডাকিতেন "বাবা!" রামকৃষ্ণের সন্তান হয় নাই বটে কিন্তু আজ ভক্তিরবশে ভগবান পুত্ররূপে প্রকাশিত হইয়া ডাকিতেছেন—"বাবা!" মানুষের মুখ হইতে মানুষ যখন এই মধুমাখা বোল শ্রবণ করে, তখন মানুষ মায়ার দুর্ভেদ্যজালে জড়িত হয়; আর ভগবানের মুখ হইতে যখন মানুষ এই মধুমাখা বোল শ্রবণ করে, তখন মায়ার কঠিন বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনি শ্রীমতী যশোদা বা কৌশল্যার ভাবে পরিণত হইয়া সেই শ্রীগোপাল বা শ্রীরাম মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে স্বশরীরে বৈকুণ্ঠ যাইবার শক্তিলাভ করে। সে সময়ে, সে, সমস্ত জগতের পিতা মাতা, এই মহাভাবে পরিণত হইয়া পশু পক্ষী

কীট পতঙ্গাদি স্থাবর জঙ্গম সমুদয় পদার্থকে অপত্যস্নেহপূর্ণ-দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া যে অনন্ত সুখসাগরে নিমগ্ন হয়—সে সুখের বর্ণনা নাই—তুলনা নাই। ভগবানকে যিনি পুত্র-ভাবে ধরিতে পারেন, সমস্ত জগতের শক্তি তাঁর চরণে পুত্রবৎ লুণ্ঠিত হয়—তখন তিনি জগৎপিতার পিতা। রামকৃষ্ণ ভক্তির এই উচ্চভাবে কতদিন বিভোর ছিলেন বলা যায় না। এই অবস্থার পর তাঁর মহাভাব অর্থাৎ মধুর ভাব প্রকাশিত হয়। এই মহাভাবে সমস্ত ভাবের জমাট। ভগবান স্বামী এবং আমি তাঁর স্ত্রী; এই যে ভাব ইহা অপেক্ষা উচ্চতম ভাব নাই।

রামকৃষ্ণের মধুর ভাব।

মধুর ভাবের সাধনার কালে একদিন কাতরভাবে বলিতে-ছিলেন :..."কৃষ্ণ দর্শনের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইতেছে নিষেধ মানে না, বারণ শুনে না, কৃষ্ণ এনে দেখাও। দেখ সখি! চেয়ে দেখ, আমার প্রাণ কোথায়? প্রাণ ওষ্ঠাগত, প্রাণ বক্ষ পিঞ্জর ভেদ করিয়া বুঝি বা বাহির হইয়া যায়। আমি তোমায় একবার মাত্র চোখের দেখা দেখিব।" এইরূপে রোদন করিতে করিতে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তিনি আপনাকেই শ্রীমতি জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং তাঁর ন্যায় বেশ ভূষাদি করিয়া কৃষ্ণকে স্বামী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কখন বিরহে কাতর হইয়া গাহিলেন :—

শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই।
আমি কি সুখে আর ঘরে রই॥
শ্যাম যে মোর নয়নের তারা,
তিলেক আধো না দেখলে সই হই দিশেহারা।
আবার শ্যামের লেগে ভেবে ভেবে দিশেহারা হ'য়ে রই॥
শ্যাম যদি মোর হ'ত মাথার চুল,
আমি যতন করে বাঁধতুম বেণী সই দিয়ে বকুল ফুল।
আমি বোনপোড়া হরিণের মত ইতি উতি চেয়ে রই॥
শ্যাম যখন ওই বাজায় গো বাঁশী,
আমি তখন যমুনাতে জল লয়ে আসি,
আমার কাঁকের কলসী কাঁকে রইল,
শ্যামের বদন পানে চেয়ে রই॥

এই সময়ে তিনি কখনও কখনও মৃতবৎ হইয়া পড়িতেন। তখন নাড়ি পাওয়া যাইত না—শরীর মড়ার মত হইয়া যাইত। মহা ভাবের অনেক লক্ষণ এই। কিন্তু লোমকূপ দিয়া শ্রীচৈতন্যের মত শোণিত নির্গমন হইত না, অথবা শরীরের সন্ধিস্থল বিচ্ছেদও ঘটিত না। পূর্ব্বোক্ত বারুদির ব্রহ্মচারী মহাশয়ে মহা ভাব প্রকাশকালে লোমকূপ দিয়া স্বেদবিন্দুর ন্যায় রক্তবিন্দু প্রকাশিত হইত এবং শরীরের সন্ধিস্থল বিচ্ছেদও ঘটিত। আমাদের বোধ হয় বারুদির ব্রহ্মচারী মহাশয়, রামকৃষ্ণ অপেক্ষা এই বিষয়ে উচ্চতর অবস্থা পাইয়াছিলেন। তবে রামকৃষ্ণ কলিকাতার নিকটে থাকিয়া কেশব সংস্পৃষ্ট হওয়ায় এবং বিবেকানন্দের ন্যায় প্রতিভাশালী শিষ্য পাওয়ায় পৃথিবী বিখ্যাত হইয়াছেন।

Full Many a flower is born to blushunseen,
And waste its sweetness on the desert air.

(Gray.)

পূর্ব্ববঙ্গে কি এমন কেহ প্রতিভাশালী লেখক নাই, যে বারুদির ব্রহ্মচারীর একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী লিখিয়া আপনার লেখনী সার্থক করেন?

তন্ত্র মতে সাধনা।



কলিতে তন্ত্রপ্রদর্শিত পথই প্রশস্ত। এই তন্ত্র বেদের একটী প্রবল শাখা। ইহা অতি গুহ্য শাস্ত্র। ইহার সাধনও গুহ্যাতিগুহ্য। ইহা বীর প্রকৃতি মানবের জন্য। বৈদিক পথ বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা দিয়া ভগবানে যাওয়া যায়; কিন্তু অনেক দেরি হয়—তন্ত্রমার্গে শীঘ্র হয়। শীঘ্র হয় যেমনি, এ পথে তাড়কা রাক্ষসীর ভয়ও তেমনি। যাঁহারা ভগবানের জন্য মারিয়া—বীর প্রকৃতি বিশিষ্ট তাঁহারা এ পথে আসিয়া সাধনা করিলে কৃতকার্য্য হয়েন। প্রলোভনকে সম্মুখে রাখিয়া ভগবানের চিন্তা করিতে হইবে। এমনি মন্ত্রের ও গুরুর শক্তি যে, সে শক্তি প্রভাবে প্রলোভনের শক্তি পরাস্ত হইবে। উলঙ্গা রমণীর সম্মুখে বসিয়া মার নাম জপিতে হইবে—জপিতে জপিতে সেই উলঙ্গা রমণীতে মাকে দর্শন করিতে হইবে। অমাবস্যার রাত্রে মৃতদেহের উপর বসিয়া মার সাধনা করিতে হইবে;

কালীমন্ত্র জপিতে জপিতে নানাবিধ ভয় আতঙ্ক বিভিবিকার মধ্যে পতিত হইয়া অচলমনে মা কালীর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। একবিন্দু ভয় হইলে সর্ব্বনাশ হইবেক। হয় প্রাণ হারাইতে হইবেক, না হয় উন্মাদ হইতে হইবেক। মন্ত্র জপিতে জপিতে মন্ত্রশক্তিতে মৃতদেহে জীবনী শক্তির সঞ্চার হইবে—তখন মৃতদেহ নড়িতে থাকিবে—বিকট শব্দ করিতে থাকিবে—কিন্তু সাধক, মা কালীর উপর আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া মার অভয়পদধ্যানে বিভোর থাকিবেন;—মা তখন প্রকাশিত হইয়া সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

উপরে যে সব কথা বলিলাম বড় সত্য, বড় রহস্যময়। সাধনাক্ষেত্রে নামিতে হইলে নেপোলিয়ন শিবজী অথবা ভীমের অপেক্ষা অধিক সাহসের আবশ্যক এবং সর্ব্বোপরি জগজ্জননীর পাদপদ্মে অচলা ভক্তির প্রয়োজন। যাহারা ভীরু সংসারাসক্ত তাহাদের জন্য এ পথ নহে। এইজন্য এই মার্গ অতি গুপ্ত। এই মার্গের শাস্ত্র অতি গুপ্ত, এই মার্গের অনুষ্ঠান অতি গুপ্ত। বেদ পুরাণ শুনিতে হয় তন্ত্র অনুসারে কার্য্য করিতে হয়। যেমন বিজ্ঞানের মধ্যে Experimental Science সেইরূপ ধর্ম্মমধ্যে ইহা Experimental Science। এই শাস্ত্রের উপদেশানুসারে উপযুক্ত অধিকারী হইয়া কার্য্য কর ফল হাতে হাতে পাইবে। তুমি যাহা দেখিতে চাও ইহাতে দেখিতে পাইবে। ভূত আছে কি না দেখিতে চাও একজন সিদ্ধ তান্ত্রিকের কাছে যাও তিনি তোমায় দেখাইবেন। পরলোক দেখিতে চাও, ঐরূপ কোন ব্যক্তির নিকটে যাও—উপযুক্তরূপ

যন্ত্র কর দেখিতে পাইবে। তন্ত্র মৃত শাস্ত্র নহে—জীবন্ত শাস্ত্র।

রামকৃষ্ণ পরমহংস নানামতে সাধনা করিলেও তন্ত্র মতই তাঁহার প্রধানতম মত ছিল। ইনি তন্ত্র মতেই প্রধানতঃ সিদ্ধিলাভ করেন। এই সাধনাই তাঁহার সাধনারূপ দেহের মজ্জা ছিল। কলিতে তন্ত্রই সার—কোন না কোন প্রকারে অন্যান্য সকল মার্গের সাধকদিগকে তন্ত্র মতেই প্রকারান্তরে চলিতে হইতেছে। ইনি বলিতেন যেমন বাদসাহি আমলের টাকা এখন চলে না—সেইরূপ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন চলে না—এখন তন্ত্রমতেই চলিতে হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন।

তন্ত্রের যত প্রকার সাধনা আছে রামকৃষ্ণ সমুদয়ই করিয়াছিলেন। পঞ্চমকারাদি সাধনা, প্রলোভনের বস্তু সকল সম্মুখে রাখিয়া অচলা ভগবদ্ভক্তির সহিত যেমন করিতে হয় করিয়াছিলেন—এবং সবেতেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের ভৈরবী এখনও জিবীতা আছেন। এই ভৈরবী এক অসামান্যা রমণী—সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিতা। ইনি সাক্ষাৎ ভগবতী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর সাহায্যে রামকৃষ্ণ তন্ত্রের কঠিন কঠিন সাধনায় উত্তীর্ণ হয়েন।

রামকৃষ্ণ যখন তন্ত্রমতে সাধনা করিতেছিলেন তখন ষোড়শী পূজার্থে শ্বশুরালয়ে গমন করেন। তখন স্ত্রীর বয়স ষোল বৎসর। রামকৃষ্ণ ষোড়শী স্ত্রীকে জগজ্জননী জ্ঞানে পূজা করিবার জন্য জবাফুল চন্দনাদি সহিত শ্বশুরালয়ে যাত্রা করেন। তথায় পহুঁছিয়া উঠানের মধ্যে স্ত্রীকে দেখিতে পাইবামাত্র

ভক্তির সহিত স্ত্রীর চরণ পূজা করিয়া ফেলিলেন। শ্বশুরবাড়ীতে হৈ—চৈ পড়িয়া গেল। বাটীর স্ত্রীলোকেরা রামকৃষ্ণের স্ত্রী বাঁচিবেনা মনে করিয়া কত আশঙ্কা করিতে লাগিল। কিন্তু স্ত্রী মরেন নাই—সাক্ষাৎ ভগবতীরূপে জিবীতা আছেন।

রামকৃষ্ণের কালী পূজা।



রামকৃষ্ণ কালীমূর্ত্তিকে একদিনের জন্যও পাথর বলিয়া জানিতেন না। তিনি জানিতেন এই মূর্ত্তি তাঁর সচ্চিদানন্দময়ী জগজ্জননী। দেবদেবীমূর্ত্তিতে তাঁর জড়বুদ্ধি আদতে ছিলনা। এইজন্য তিনি একদিন কেশবচন্দ্র সেনকে বলিয়াছিলেন "ঠাকুর দেখিলে তোমার খড় মাটীর কথা মনে আসে কেন? চৈতন্যের ভাব মনে আসেনা কেন? এই বিশ্বাসে রামকৃষ্ণ সেই কালীমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া যখন পূজা করিতেন তখন ভক্তিতে কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের জলেই পূজা করিতেন। অতিভাবের আবেশ হইলে মন্ত্র ভুলিয়া যাইতেন—তখন আপনার সরল হৃদয়ের থালে ভক্তি প্রেমের নৈবেদ্য সাজাইয়া সাদা ভাষায় কহিতেন!—"মা! এই বেলপাতা নে। মা! এই ফুল নে। মা! এই আমাকে নে।" শেষের কথাটী বলিতে বলিতে তাঁর কথনও কথনও সমাধি হইত।

আবার কথনও দুইহাতে সচন্দন পুষ্প লইয়া কহিতেন:— "মা! এইনে তোর ভাল এইনে তোর মন্দ" বলিয়াই দুহাতের

ফুল মার চরণে ফেলিয়া দিতেন। আবার দুহাতে সচন্দন পুষ্প লইয়া "মা! এইনে তোর সুচি এইনে তোর অসুচি।" আবার:—"মা! এইনে তোর সু এইনে তোর কু।" এই-রূপে পূজা করিতে করিতে রামকৃষ্ণ কখন প্রেমভরে কালীর গলা জড়াইয়া ধরিতেন; কখনও বা বালকের মত তড়াক করিয়া মার স্কন্ধে উঠিয়া বসিতেন। কখনও মহাদেবের সহিত নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতেন। কখনও ভাবে গদগদ হইয়া গাহিতেন:—

"এবার আমি বুঝবো হরে।
মায়ের ধরবো চরণ লব জোরে॥"

কোনদিন রামকৃষ্ণ মার সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন "মা! তুই এক মূর্ত্তিতে গৃহস্থের কুলবধু সতী—আবার একমূর্ত্তিতে মেছোবাজারের খান্‌কি—মা! আমি তোর সন্তান।" এই কথা বলিতে বলিতে ভাবাবেশে জড়বৎ হইয়া বসিয়া থাকিতেন।

কখন পূজা করিতে গিয়া কেবল মাত্র চামর ব্যজন করি-তেন—করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া পড়িতেন।

একদিন পূজা করিবার জন্য রামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পূজার আসনে বসিবামাত্র আত্মজ্ঞান প্রবল হইল। এই দেহ মার মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে মা রহিয়াছেন। রামকৃষ্ণ দুই চক্ষু মুদিত করিয়া আপনার মধ্যে তাঁর কালীমাকে দেখিতে দেখিতে পাষাণবৎ স্তম্ভিত হইয়া থাকিলেন। তারপর ধীরে ধীরে চাহিলেন—পূজার চন্দন ফুল বিল্বপত্র আপনার

পায়ে দিলেন। তারপর নৈবেদ্য হইতে চাল কলা সন্দেশ লইয়া খাইতে লাগিলেন। তখন মন্দিরের অন্যান্য পাণ্ডারা—সে অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া—"পাগল! পাগল!" বলিয়া মন্দিরে প্রবেশিয়া রামকৃষ্ণকে বাধাদিতে গেলে; রামকৃষ্ণ এমনি প্রবল বেগে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে সে ব্যক্তি দেহ আড়ষ্ট করিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। এ সময়ে রামকৃষ্ণের ভিতরে অসুরনাশিনীর দুর্জ্জয় বল প্রকাশ হইয়াছে—এখন রামকৃষ্ণকে বাধা দেওয়া মানুষের কি দেবতার সাধ্য নহে। পাণ্ডারা বাধা দিয়া কিছু না করিতে পারিয়া রাগে উন্মত্ত হইয়া—"পাগলের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য, রাণী রাসমণিকে সেদিনকার সমুদায় ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক দরখাস্ত পাঠাইল। রাণী রাসমণি সে দরখাস্ত পাঠ করিয়া ক্রোধে আগুণ হইয়া উঠিলেন। আপনার জামাই মথুরবাবুকে ডাকিলেন। ডাকিয়া "হাঁ মথুর! এসব কি কাণ্ড? রামকৃষ্ণ পূজা করিতে গিয়া নৈবেদ্য খেয়েছে—আমার এরচেয়ে আর সর্ব্বনাশ কি হ'তে পারে! পাগল যদি সহজে আমার এখান হ'তে না যায় তো তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দাও।" রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে এই কথা বলিয়া সেই দরখাস্ত খানি মথুরবাবুর হাতে দিলেন।

মথুরবাবু দরখাস্ত পড়িয়া অবাক হইলেন—কিছুই ভাবিয়া ঠিক পান না। ইতিপূর্ব্বে রামকৃষ্ণের প্রতি মথুরবাবুর বড়ই ভক্তি জন্মিয়াছিল। মথুরবাবু বুঝিয়াছিলেন যে রামকৃষ্ণ এক জন সিদ্ধপুরুষ—অসামান্য ব্যক্তি। তাই দরখাস্ত পড়িতে পড়িতে মথুরবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল।

এদিকে বাতাসে চড়িয়া রাসমণির আদেশ বাক্যটা (অপমান ক'রে তাড়িয়ে দাও) দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ঝুপ করিয়া আসিয়া পড়িল। রামকৃষ্ণের শিষ্য সেই কথাটা বর্দ্ধিত আকারে শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণের নিকট গিয়া বলিল "আর কেন? এখান হ'তে চলুন—রাসমণির ভাত খাওয়া উঠেছে।" কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ চমকিত ভাবে কহিলেন "কি হয়েছে? কি হয়েছে? শিষ্য :—হবে আর কি? রাসমণি তোমায় মেরে তাড়িয়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন। তাই বলছি চলুন আপনাকে লইয়া অন্যত্র যাই।" রামকৃষ্ণ তখন বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণের কান্না দেখিয়া শিষ্যটী জিজ্ঞাসিলেন "রাসমণির ভয়ে কাঁদছেন নাকি?" তখন রামকৃষ্ণ কহিলেন "না আমি রাসমণির ভয়ে কাঁদছি না। তবে কিনা, সাংসারিক লোকেরা ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব আদতে বুঝে না। আমি যে নৈবেদ্য কি ভাবে খেয়েছি—তা সাংসারিক লোকেরা বুঝিবে কি প্রকারে? তাই ভাবছি,—রাসমণি আমার অপমান করিলেও করিতে পারে!" তখন শিষ্য আবার কহিল, তবে এখান হতে পলাই চলুন।" রামকৃষ্ণ—কহিলেন "আমি আমার অপমানের ভয়ে কাঁদছিনা।" শিষ্য :—তবে কেন কাঁদছেন। রামকৃষ্ণ :—"রাসমণি যদি আমার অপমান করে; মা যে রাসমণিকে রাখবেন না। যে রাসমণির অন্নজলে এত বৎসর প্রতিপালিত হ'লাম; সে—রাসমণিকে মার ক্রোধ হ'তে কি প্রকারে রক্ষা ক'রবো, সেই ভেবে ভেবে আমি মার ভয়ে কাঁদছি—মানুষের ভয় আমি এক তিল রাখি না।" শিষ্য গুরুর উচ্চভাব দেখিয়া অবাক হইল—শরীর কণ্টকিত হইল।

কয়েকদিন পরে রাসমণি কালীবাড়িতে উপস্থিত হইলেন। সেই শিষ্যটী তখন রাসমণিকে দেখিয়া ভয় পাইলেন—মনে মনে ভাবিলেন আজ গুরুর কপালে কি আছে তা জানিনা। শিষ্য ভয়ে জড়সড় হইয়া গুরুর কাছে আসিয়া ভয় পূর্ণ স্বরে বলিল—"রাসমণি আসিয়াছেন—এখন উপায় দেখুন।" কথা শুনিবা মাত্র রামকৃষ্ণ ভোঁ করিয়া দৌড় দিলেন। রামকৃষ্ণ ভয়ে ছুটিতে লাগিলেন—ছুটিয়া তাঁর কালীমার ঘরে ঢুকিলেন—মার পিছনে গিয়া লুকাইলেন। ভয় পাইলে বালক যেমন মার পিছনে লুকায়—লুকাইয়া নির্ভয় হয়; আজ রামকৃষ্ণ রাসমণির ভয়ে জগজ্জননীর পিছনে লুকাইয়া নির্ভয় হইলেন। আজ যদি রাসমণি শত শত তরবার লইয়া রামকৃষ্ণকে মারিতে আসে, তো, রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভয়;—কেননা বালক আজ তার জগজ্জননীর আশ্রয় পাইয়াছে—মারকাছে বালকের কিসের ভয়? মার পিছনে রামকৃষ্ণ বসিলেন—আনন্দপূর্ণ মূর্ত্তিতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছেন, রাসমণি ঠাকুরঘরে আসিতেছে কি না? রামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় ভুল ভুল করিয়া চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে রাসমণি কালীঘরে প্রবেশ করিলেন।

রাসমণির পিছনে কয়েকজন পাণ্ডা "মা! ঐ দেখুন পাগল আপনার ভয়ে কালীর পিছনে গিয়া বসিয়াছে—এসব বদমায়িসি।"

রাসমণি রামকৃষ্ণের দিকে একবার তাকাইলেন—হৃদয়ে রাগ জ্বলিয়া উঠিল। কালীর মুখের দিকে তাকাইলেন—হৃদয়ে নবীন ভাবের উদয় হইল। আবার রামকৃষ্ণের মুখের

দিকে চাহিলেন তখন রাসমণির রাগ কমিয়া আসিল। আবার কালীর মুখের দিকে চাহিলেন—রাসমণির প্রকৃতি চমকিয়া উঠিল—শরীর কণ্টকিত হইল। রাসমণি গদগদকৃতবাসে করযোড়ে কালীর সম্মুখে বসিলেন। মনে মনে কতই ভাবিতে থাকিলেন—ভাবেন আর এক একবার কালীর মুখের দিকে চাহেন। রাসমণি কালীর এরূপ জীবন্তভাব কখনও দেখেন নাই। এতদিন কালী দর্শন করিতেছেন এরূপ জীবন্তভাব কখনও দেখেন নাই। রাসমণি ভাবিলেন "আমরা সংসারি লোক, ধর্ম্মের তত্ব কি বুঝি? রামকৃষ্ণ হয়তো ঠিক কাজই করিয়াছে। রামকৃষ্ণ যে মার প্রকৃত ভক্ত, তা বেশ দেখিতেছি। রামকৃষ্ণের কি দৃঢ় বিশ্বাস! আমার ভয়ে মার পিছনে লুকাইয়াছে—লুকাইয়া একবারে ভয়হীন! আমরা ঘোর বিষয়ী—নরকের কীট—আমরা ধর্ম্মের তত্ব কি বুঝি? অমন ভক্তের প্রতি অপমানের কথা বলিয়া বড়ই অপরাধ করিয়াছি।" ভাবিতে ভাবিতে রাসমণির দুচক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ভাবভরে সেই অশ্রুবেগ ক্রমশঃ প্রবল হইল। রাসমণি কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিলেন "মহাপাপ করিয়াছি; এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" আবার ভাবিলেন "কি দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব?"

মনে ভাব উঠিল—"মাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেনারসি শাড়ি পরাইব। হাজার হউক, দুহাজার হউক, যত টাকা লাগে দেব—সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে বেনারসি শাড়ি তাই মাকে পরাইব। ইহাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয় হইতে পারে।" আবার ভাবিতেছেন, কালীকে বেনারসী শাড়ি পরান শাস্ত্র সম্মত কি

না? পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা দেবেন কি না? এ প্রকার ভাবের যখন একটা খুব আন্দোলন মনের মধ্যে উপস্থিত হইল, তখন রামকৃষ্ণ মার পিছনে বসিয়া প্রত্যাদিষ্ট হইলেন "রাসমণির কান নাই, আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না। তুই ওকে বল যে, বেনারসী শাড়ি আমায় পরাবে তাতে কোন দোষ হবে না।" রামকৃষ্ণ মার কথা শুনিবামাত্র ক্রত রাসমণির কাছে আসিয়া রাসমণির আটুতে হাত দিয়া বলিতেছেন "ও রাসমণি! মা বলছেন, ওর কাণ নাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না; তুই ওকে বল, তা বেনারশী শাড়ি পরাবে তাতে দোষ হবে না।" যাঁর ভয়ে ভক্ত মার আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁরই শরীর স্পর্শ করিয়া অকুতোভয়ে রামকৃষ্ণ জগজ্জননীর হুকুম জারি করিলেন। রাসমণির মনের কথা রামকৃষ্ণ কি প্রকারে জানিলেন—এ কথা ভাবিতে ভাবিতে রাসমণির হৃদয় প্রাণ-ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। রাসমণি কাঁদিতে কাঁদিতে দেবী প্রণাম করিলেন, তারপর রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বাগানের বাড়িতে ফিরিলেন। রাসমণির জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য মা কালী এ এক নূতন ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছেন।

রাসমণি বাগান বাড়িতে আসিয়া জামাইকে বলিলেন, "মথুর! কাজটা ভাল হয় নাই। রামকৃষ্ণের প্রতি ওরকম কটু কথা বলায় আমার অপরাধ হয়েছে। একে ব্রাহ্মণ তাতে কালীর প্রকৃত ভক্ত। আমার ভয়ে বালকের ন্যায় মার পিছনে লুকয়েছিলেন। অমন সাধু ভক্তের প্রতি কটূক্তি বলেছি—অপমান করিবার কথা কয়েছি। বড়ই অন্যায় হয়েছে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য।"

এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া মন্দিরের সমস্ত ঘটনা মথুর বাবুর নিকট কহিলেন। মথুর বাবু শুনিতে শুনিতে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন রাসমণি বলিলেন "বাবা! যা হউক একবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছথেকে একটা ব্যবস্থা লওয়া ভাল। তা তুমি শীঘ্র হাতির বাগান ও ভাটপাড়া হতে পণ্ডিত আনিয়ে এই কালী বাড়িতেই একটী সভা কর। কালীকে বেনারসী শাড়ী পরান সম্বন্ধে কি বলেন, সেটা শুনে তবে কাজ করা যাবে। নাহ'লে নানালোকে নানা কথা বলবে।" রাসমণির আদেশানুসারে মথুর বাবু কালী বাড়িতে একটী প্রকাণ্ড সভার আয়োজন করিলেন।

ভাটপাড়া, হাতির বাগান ও নবদ্বীপের বড় বড় পণ্ডিত উপস্থিত। প্রকাণ্ড সভা। সভার একটী পার্শে রামকৃষ্ণ দীনভাবে বসিয়া আপনভাবে নিমগ্ন। পণ্ডিতেরা নানাবিধ শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। কালীকে বেনারসী শাড়ি পরাবার কথা লইয়া ভয়ানক তর্কবিতর্কের পর প্রধান পণ্ডিত মহাশয় মথুর বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মথুর বাবু! শাস্ত্রেতো তা বলে না।" যেমনি এই কথা বলা, অমনি রামকৃষ্ণ গম্ভীরভাবে উঠিলেন—পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া শক্তিরূপী ভাষায় কহিলেন "তোমাদের শাস্ত্র ফাস্ত্র রেখে দাও! মা বলেছেন, রামকৃষ্ণ নাচতে নাচতে কাপড় পরাবে।" এমনি মধুরস্বরে বৈদ্যুতিক তেজে এই কথা উচ্চারিত হইল, যে সেই স্থলের সকলেরই হৃদয় সে কথা শুনিয়া ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কাহারও চক্ষু জলপূর্ণ কাহারও প্রাণ বিগলিত হইল। তখন প্রধান পণ্ডিত মহাশয় ভাবে

গদগদ হইয়া উৎসাহের সহিত কহিলেন, "মথুর বাবু! এতক্ষণে সবই ঠিক হইয়াছে। রামকৃষ্ণ প্রকৃত মার ভক্ত। রামকৃষ্ণ যা বলিতেছেন এ মার মুখের কথা। অতএব এ সব শাস্ত্র সম্মত। ভক্ত যাহা বলেন তাহাই শাস্ত্র, শাস্ত্রই এ কথা কহিয়াছেন। অতএব আর ভয় বা সংশয়ের কারণ নাই। মাকে বেনারশী শাড়ি পরাবেন।"

অমাবশ্যার রাত্রে মাকে ধুমধামের সহিত বেনারসী শাড়ি পরান হইয়াছিল।

কেশবের সহিত আলাপ।

যেমন শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের সঙ্গে নিত্যানন্দের জীবনের যোগ, আমাদের রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনের সহিত কেশবচন্দ্র সেনের জীবনের সেইরূপ সংযোগ। যেমন গৌরাঙ্গের কথা মনে হলেই নিত্যানন্দের কথা মনে আসে—সেইরূপ রামকৃষ্ণের কথা মনে হইলেই কেশবের কথা মনে আসে। কেশবের সহিত রামকৃষ্ণের সম্মিলনের কথা বড়ই মনোহর।

অন্নদাচরণ মল্লিক নামক কেশবের সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ভদ্রলোক কার্য্যোপলক্ষে দক্ষিণেশ্বর যান। সেখানে কালী বাড়িতে বেড়াইতে বেড়াইতে, একটী বড় বট গাছের তলায় দেখেন, একব্যক্তি বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন—তাঁর দুচক্ষু মুদিত,

মুখে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শান্তি—যেন প্রতি লোমকূপ দিয়া আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অন্নদা বাবু অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তারপর বসিলেন। রামকৃষ্ণের গায়ে পিপিলিকা উঠিতেছে—মাথার উপরে বট ফল পড়িতেছে—রামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞানহারা। কিয়ংক্ষন পরে রামকৃষ্ণের সংজ্ঞা-লাভ হইল। তখন অন্নদা বাবু রামকৃষ্ণে প্রণাম করিবার আয়োজন করিতে না করিতে রামকৃষ্ণ আগে অন্নদা বাবুকে প্রণাম করিলেন। অন্নদা বাবু একটু অপ্রতিভ হইলেন। কিয়ংক্ষণ পরে অন্নদা বাবু রামকৃষ্ণকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রামকৃষ্ণ এমনি সরলভাবে সে কয়টী প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন, যে অন্নদা বাবু অবাক হইয়াগেলেন। অন্নদা বাবু রামকৃষ্ণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, কালী বাড়ির অন্যান্য লোকদিগকে রামকৃষ্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা রামকৃষ্ণকে পাগল বলিয়া উড়াইয়াদিল। এই অন্নদা বাবু কেশবের নিকটে গিয়া সমুদয় কথা বলিলেন। কেশবের ইচ্ছা হইল একদিন নিজে গিয়া দেখা করেন। অন্নদা বাবুর সঙ্গে কেশব একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিলেন। রামকৃষ্ণের সহিত কথা কহিতে কহিতে—ধর্ম্মালোচনা হইতে হইতে হঠাৎ রামকৃষ্ণ মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন। কেশব তখন অবাক হইলেন। কেশব এরূপ অবস্থা মানুষের কখনও দেখেন নাই। পুস্তকে ভারতবর্ষের ঋষিদিগের সমাধির কথা পড়িয়া-ছিলেন;—সমাধি কখনও দেখেন নাই। রামকৃষ্ণের সেই অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন এই বা সমাধি? কেশব কিয়ংক্ষণ পরে রামকৃষ্ণের সংজ্ঞালাভ হইলে, বিদায় হইলেন। প্রতাপ

বাবু প্রভৃতির নিকট গিয়া গল্প করিলেন। অনেকেই স্নায়বিক রোগ বলিয়া হাসিয়া উড়াইলেন।

একদিন রামকৃষ্ণ আপনার শিষ্যদিগের নিকটে বসিয়া বলিতেছিলেন "আমি একবার কেশবের নিকট যাইব। কেশব বড় ব্রহ্মভক্ত। আমি কেশবকে ভাল করিয়া দেখিব। অনেক বৎসর পূর্ব্বে আদি ব্রাহ্ম সমাজে উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে ব্রহ্মধ্যাননিরত কেশবকে দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইয়াছিল। সেই কেশব আজকাল না কি বড় ধার্ম্মিক হইয়াছে;—আমি কেশবকে ভাল করিয়া দেখিব।" পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "সেখানে গিয়া ফল কি? কেশবসেন যবন, সেখানে গেলে আপনার নিন্দা হবে।" রামকৃষ্ণ বলিলেন, সে যবনই হউক আর যাহাই হউক শুনিতেছি সে বড় ব্রহ্মভক্ত আমি তাকে একবার দেখিতে যাইব। সে আমার কাছে কয়দিন আসিয়াছে; আমার একবার যাওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে কাশীপুরের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহিম বাবুকে দেখিয়া রামকৃষ্ণ আনন্দের সহিত কহিলেন "মা আমার সত্য। নহিলে এমন সময়ে মহিম আসিবে কেন?

মহিম বাবুকে রামকৃষ্ণ সমুদয় কথা বলিলেন। মহিম বাবু কেশবের বিশেষ বন্ধু। মহিম বাবু আনন্দিত হইয়া কহিলেন "এত অতি শুভকথা। আমি আজই কেশব বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া সব ঠিক করিব।" মহিম বাবু সেই দিন কেশব বাবুর সহিত দেখা করিয়া রামকৃষ্ণের কথা বলিলে কেশব বাবু আন-

ন্দের সহিত বলিলেন "এত আমার সৌভাগ্য! তবে কাল প্রাতে ৯টার সময় তুমি তাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিবে অথবা পঠাইয়া দিবে।

পরদিবস যথা সময়ে কেশবের সহিত দেখা করিবার জন্য রামকৃষ্ণ এক খানি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী করিয়া কমল-কুটীরে ঠিক ৯টার সময় উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণ গাড়ি হইতে নামিয়া দ্বিতলের উপরে উঠিলেন। কেশব তখন সঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উপাসনা করিবার উদেযাগ করিতে ছিলেন। উপাসনা গৃহের দ্বারদেশে চাহিয়া দেখেন রামকৃষ্ণ উপস্থিত। দেখিয়াই কেশব বাবু আনন্দে পূর্ণ হইয়া "সুপ্রভাত! সুপ্রভাত" বলিতে বলিতে রামকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে ভাবভরে যেই কহিলেন "আপনি এসেছেন"? আমার অতিশয় সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন" অমনি রামকৃষ্ণ ভক্তিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া, "কেশব। আমি এসেছি, মাইরি "আমি" এসেছি" বলিয়াই ভূতলে পড়িয়া গেলেন। রামকৃষ্ণের জ্ঞান নাই, রামকৃষ্ণ মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলেন। মহা পুরুষের বাক্যের এবং ভাবের অর্থ সে ঘরে আর কেহ বুঝিয়াছিলেন কি না জানিনা, কিন্তু মহাপুরুষ যিনি তিনি বুঝিতে পারিয়া ভক্তির উচ্ছাসে কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতবৎ শায়িত রামকৃষ্ণের চুপা জড়াইয়া ধরিলেন, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তখন কেশবের আত্মা চারিদিকে পরমাত্মার জ্যোতি দেখিতে ছিলেন; আর সেই জ্যোতি সাগরে রামকৃষ্ণ ডুবিয়া আত্মহারা হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইতেছিলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মরা রামকৃষ্ণকে ঘেরিয়া বসিলেন। কেহ বাতাস দিতে লাগিলেন.

এবং একজন ব্রাহ্ম তখন হারমোনিয়ম তুল্য গলায় সুর দিয়া গাহিতে লাগিলেন :—

"চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরি"

কমল কুটীর পবিত্র হইল, ব্রাহ্মধর্ম্ম ধন্য হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি হইতে এরূপ উৎসব এক দিনও হয় নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামকৃষ্ণের বাহ্যজ্ঞান হইল, চাহিয়া দেখিলেন দুচক্ষু প্রেমের নেশায় ঢুলু ঢুলু। কেশব চন্দ্র তখন গদগদ ভাবে অতি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন "এখন কেমন বোধ হ'চ্ছে?"

রামকৃষ্ণ আপনার ভাবসমুদ্রের ভিতর হইতে উত্তর করিলেন "এখনও "উম"টো আছে "উম"টো গেলে কথা কহিব।"

কেশব বিস্মিত ভাবে কহিলেন, "উম" কি? বুঝিতে পারিতেছিনা।"

রামকৃষ্ণ আবার গভীর ভাবের সহিত কহিলেন, "বুঝতে পারছনা, কমানের আওয়াজ হয় "গুড়ুম"। আওয়াজ হইবার পর গুড়ুমের "উম"টা কিয়ৎক্ষন থাকে। আমাতে ভগবানের সেই "উম"টা এখনও আছে। ঐ "উম"টা গেলেই কথা কহিব। কথা শুনিতে শুনিতে কেশব ও অন্যান্য ব্রাহ্মগণ ভক্তিভরে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন প্রত্যেকের জীবনের উপর দিয়া প্রেমের বন্যা ছুটিয়া গেল। আহা! কি পবিত্র সুখ। কি গভীর আনন্দ!

কিয়ৎক্ষণ পরে রামকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন। কেশব চন্দ্র সন্মুখে কর যোড়ে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমায় কি প্রকার দেখছেন?"

রামকৃষ্ণ, "কেশব তোর লেজ খ'সেছে —মাইরি তাই তোর লেজ খ'সেছে"।

কেশব, "কথার অর্থ বুঝতে পারছিনা"।

রামকৃষ্ণ, "বুঝতে পারছনা, বেঙাচি যতক্ষণ জলে থাকে তার লেজ থাকে, যেই লেজ খসে অমনি লাফাইয়া ড্যাঙায় উঠে। কেশব তোর লেজ খ'সেছে, তুই সংসার কুপ হ'তে লাফায়ে ব্রহ্ম ডাঙায় উঠেছিস"।

কথা শুনিয়া কেশব বাবু দীনের দীন হীনের হীন হইয়া গেলেন—কাঁদিতে কাঁদিতে সরম মাখানা সুরে কহিলেন "আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার তাই হয়"।

রামকৃষ্ণ আবার জোরে বলিলেন "মাইরি তোর লেজ খ'সেছে; মাইরি তোর লেজ খ'সেছে"!

কিয়ৎক্ষণ পরে রামকৃষ্ণ চলিয়া আসিলেন। সেই দিন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। কেশব এক নূতন রস জীবনে পাইতে লাগিলেন —শুষ্ক ধর্ম্মকে সরস করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা।



কেশব রামকৃষ্ণের প্রেমে বড় আবদ্ধ হইলেন। কেশবের সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ, ত্রৈলক্য, বিজয় কৃষ্ণ, শিবনাথ, নগেন্দ্র, রামকুমার প্রভৃতি বড় বড় ব্রাহ্মরা দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের নিকটে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একজন প্রকৃত সাধু জ্ঞানী ও ভক্তের আদর্শ জীবন দেখিয়া ব্রাহ্মেরা আপনাদের জীবনোন্নতির অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। রামকৃষ্ণ হিন্দু যোগী হইলেও ভিতরে ভিতরে ব্রাহ্ম সমাজের আধ্যাত্মিক শিক্ষক রূপে— আচার্য্য বা গুরু রূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা প্রকৃত উপকার এতই পাইতে লাগিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হইল। এত দিন ব্রাহ্মেরা ভগবানকে পিতা, রাজা, প্রভু ও স্রষ্টা বলিয়া ডাকিতেছিলেন, এখন রামকৃষ্ণের প্রভাবে পড়িয়া ভগবানকে সুমধুর "মা" নামে ডাকিতে লাগিলেন। ভগবানকে "মা" বলিয়া ডাকা হিন্দুধর্ম্মের একটী বিশেষ ভাব। খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকার সুখাস্বাদনে বঞ্চিত। এখন খ্রীষ্টভাব প্রধান ব্রাহ্ম দলে মাতৃভাব প্রবেশ করিবা মাত্র ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা শক্তিশালিনী হইল। উপাসনার মিষ্টতা, উন্মত্ততা বাড়িল। অনেক পাপী 'মা' "মা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে পাপকে পরাস্ত করিতে পারিল।

প্রতি শনিবারে ব্রাহ্মেরা দলে দলে রামকৃষ্ণের কাছে যাইতে লাগিলেন। তাঁর পদতলে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ লাভে কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, আমি পৃথিবীর বড় বড় আচার্য্য ও পণ্ডিতের সহিত মিশিয়াছি। মোক্ষ মূলর, টিণ্ডল, হক্সলি, ষ্টানলি প্রভৃতি পৃথিবী বিখ্যাত আচার্য্য দিগের উপদেশ তাঁদের কাছে বসিয়া শুনিয়াছি; কিন্তু আজ এই অশিক্ষিত গোঁড়া হিন্দু রামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া যে শিক্ষা ও শান্তি পাইলাম এমন আর কোথাও পাইনাই। মানুষের উপরে যখন ভগবানের দয়া আসে তখন এরূপই হয়। অবিশ্বাসীগণ! একবার নয়ন ফিরাইয়া দেখ। ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে স্কুল কলেজে না গিয়াও মানুষ এতটা জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে যে প্রতাপ বাবুর মত একজন মহা পণ্ডিত ও আচার্য্য তাঁহার কাছ হইতে এমন শিক্ষা ও তৃপ্তি লাভ করেন যে, সে শিক্ষা সে তৃপ্তি সমস্ত পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিতের কাছে পাওয়া যায় না।

রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে যে সব উপদেশ দিলেন তাহাতে কেশব নূতন হইয়া গেলেন। যে কেশবের বক্তৃতা সমস্ত সভ্য জগৎ উর্দ্ধকর্ণে শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইত, যে কেশব বাগ্মিতা শক্তিতে ডিমস্থিনিস, সিসিরো, সেরিডন, গ্যারেটা ও কুসুথের সমতুল্য, সেই অসামান্য প্রতিভাশালী কেশব অশিক্ষিত পাগল রামকৃষ্ণের উপদেশে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন। কেশব প্রথমে শক্তিকে ছাড়িয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। সাধনার যে একটা বিজ্ঞান আছে, ধারাবাহিক প্রণালী আছে কেশবচন্দ্রের সে জ্ঞান হয় নাই। শক্তি ছাড়িয়া ভগবানকে যে ধরা যায় না

ইহা কেশব বুঝিতেন না। রামকৃষ্ণ একদিন বুঝাইতে লাগিলেন:—"ব্রহ্মের লক্ষণ কি? পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ ও পঞ্চতন্মাত্র, এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদির অতীত যে বস্তু তিনিই ব্রহ্ম। সুতরং ইনি নিরাকার নির্গুণ, নির্বিকার ও চিন্ময় স্বরূপ। এই সৃষ্টি ধরিয়া তাঁর লীলার ভিতর দিয়া তাঁর কাছে যাইতে হইবে। নতুবা যাওয়া অসম্ভব। তিনি সৃষ্টির নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ। সগুণ বলিলেই নির্গুণ বলিতে হইবে। স্থূল বলিলেই সূক্ষ্ম বলিতে হইবে। যেমন সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, নিরাকার হইতে সকার সেইরূপ নির্গুণ হইতে সগুণ জগতের উৎপত্তি। তিনি যে ভাবে জগতের মূল উপাদান হইলেন, সেই যে ভাব তাহাকেই শক্তি কহে। এ শক্তি তাঁহাতে বরাবর অদ্বৈত ভাবে রহিয়াছে। যেমন আগুন ও আগুনের দাহিকা শক্তি এক, দুগ্ধ ও দুগ্ধের ধবলত্ব এক অর্থাৎ আগুনের দাহিকা শক্তি আগুন হইতে পৃথক্ নহে; দুগ্ধের ধবলতা দুগ্ধ হইতে পৃথক্ নহে সেইরূপ শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। যেমন আগুনের দাহিকা শক্তি দ্বারা আগুনের জ্ঞান হয়, দুগ্ধের ধবলতা দ্বারা দুগ্ধের জ্ঞান হয়, সেইরূপ ভগবানের শক্তিরূপী যে গুণ বা সৃষ্টি সেই গুণ—শক্তি বা সৃষ্টি দ্বারা তাঁর জ্ঞান হয়। সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করিলে মূলে শক্তিকে পাই আবার শক্তিকে বিশ্লেষণ করিলে মূলে অনাদি মূল ব্রহ্ম বস্তুকে পাই। সমস্ত শক্তির তিনটী মূল সৎ চিৎ ও আনন্দ। এই তিনের যে আধার তাহাই ব্রহ্ম। তোমরা যে শক্তি ছাড়িয়া ব্রহ্ম সাধনা কর ইহা তোমাদের ভ্রম।"

কেশবচন্দ্র স্থির ধীর মনে সব শুনিলেন; শুনিয়া বুঝিলেন

এবং ব্রাহ্মসমাজে তাহা প্রচার করিলেন। রামকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত উপদেশই ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব-প্রবলতার কারণ।

ভক্ত ভগবান ও ভাগবৎ যে এক; এ শিক্ষা কেশবচন্দ্রকে রামকৃষ্ণ একটী সুন্দর উপমা দ্বারা বুঝাইলেন। রামকৃষ্ণ কেশবকে বলিলেন দেখ কেশব! আগুণ যখন কয়লায় প্রবেশ করে তখন কয়লার আর স্বতন্ত্র গুণ বা ধর্ম্ম থাকে না। তখন কয়লা আগুণ হইয়া যায়। তখন কয়লা আগুণের কার্য্য করে। সেইরূপ যখন মানুষে ভগবান প্রকাশিত হন—মানুষে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হয়—মানুষের অহং স্থলে ভগবান দেখা দেন, তখন মানুষের কিছুই থাকে না। যতক্ষণ মানুষের আপনার বলিয়া কিছু (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ভাব) থাকে ততক্ষণ ভগবান মানুষে প্রকাশিত হন না। যখন অহং বা কর্ত্তৃত্ব বোধ যায়, তখনই মানুষে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। মানুষ তখন ব্রহ্মাগ্নিতে পূর্ণ হওয়ায় যাহা বলে যাহা করে সবই ভগবানের। সে সময়ে যা উপদেশ দেয় সে উপদেশ মানুষের নহে ভগবানের সুতরাং সে উপদেশ অভ্রান্ত।” শুনিতে শুনিতে কেশবের দিব্য জ্ঞান ফুটিল। কেশব ব্রাহ্ম সমাজে অভ্রান্ত শাস্ত্রের কথা প্রচার করিলেন। এইরূপে কেশবচন্দ্র উপযুক্ত গুরুর কাছে অভ্রান্ত মানুষের কাছে মধুর উপদেশ পাইয়া পৃথিবীতে সে সব কথা বজ্রনাদে প্রচার করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ কেশব বাবু রামকৃষ্ণের উপদেশ গুলিকে ইংরাজী ছাঁচে ঢালিয়া “নব বিধান” নাম দিয়া প্রচার করিলেন। আসল জিনিসে একটু খাদ দেওয়ায় জিনিস টিকিল না। কিন্তু সত্য অবিনশ্বর। তাই কেশবের মৃত্যুর পর নববিধানের যেই দুর্দ্দশা হইল

অমনি রামকৃষ্ণের ভাব তাঁহার শিষ্যদিগের দ্বারা কতক কতক প্রচারিত হইতে লাগিল। স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকেরা রামকৃষ্ণের নাম দিয়া যাহা প্রচার করিতেছেন, তাহা কেশবের নববিধান অপেক্ষা অনেকটা বিশুদ্ধ। কিন্তু রামকৃষ্ণের যাহা প্রকৃত ভাব তাহা বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র নকুলাবধূত মহাশয়ের জীবনে হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তিরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন তাহা (কেশবের নববিধান অপেক্ষা অনেক উচ্চ হইলেও) রামকৃষ্ণপরমহংসের হিন্দুধর্ম্ম নহে; তবে ইহা ইউরোপের উপযুক্ত বটে।

রামকৃষ্ণ কেশবকে তো খুবই ভাল বাসিতেন কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কেও বড় কম নয়। ইনি বিজয় কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "ব্রাহ্মদলের মধ্যে যদি প্রকৃত ব্রহ্ম দর্শন কাহারও হইয়া থাকে তো বিজয়ের হইয়াছে। বিজয় ব্রাহ্মদলে বাঘ; কিন্তু ইহার পিছনে অনেক কেউ লাগিয়াছে; বিজয় ব্রাহ্মদলে টিকিতে পারিবেনা।" মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছে।

রামকৃষ্ণ শিবনাথ বাবুকে ইহাঁর সরল ভাবের জন্য বড়ই ভাল বাসিতেন। একদিন শিবনাথ বাবু কয়েক জন বন্ধু সঙ্গে গাড়ী করিয়া রামকৃষ্ণ পরম হংসকে দেখিতে যাইতে ছিলেন। রামকৃষ্ণ তখন সশিষ্য একগাড়ী করিয়া আলিপুরের পশুশালায় সিংহ দেখিতে যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে শিবনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা হইল দুজনের গাড়ি থামিল। রামকৃষ্ণ তখন শিব-নাথকে দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দোন্মত্ত হইয়া বলিয়া

উঠিলেন "শিবনাথ! আমি সিংগী দেখিতে যাচ্ছি—আমি সিংগী দেখিতে যাচ্ছি—মা যার উপর চড়ে"। ঠিক বালকের মত অঙ্গ ভঙ্গিমার সহিত বালকের মত সুরে যখন রামকৃষ্ণ ঐ কথা গুলি বলিয়া ছিলেন তখন শিবনাথ বাবু রামকৃষ্ণের বালকবৎ আচরণ দৃষ্টে কাঁদিয়া ফেলিয়া ছিলেন।

রামকৃষ্ণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় প্রায়ই যোগ দিতেন। সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম দিগের কোন কোন আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মনেতা দিগকে তীব্র ঔষধ প্রয়োগ করিতেন। একদা সিতির কোন ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের সময় রামকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। সভা মধ্যে স্ত্রীলোকদের স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। উপাসনার সময়ে স্ত্রী পুরুষ যুবক যুবতী একসঙ্গে বসিয়াছিল। রামকৃষ্ণ এক কোনে বসিয়া সে ব্যবস্থা দেখিয়া বড় বিরক্ত হইলেন। উপাসনার শেষে শিবনাথ বাবু বেদী হইতে জিতেন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপদেশ দিলেন। উপদেশ শেষ করিয়া যেমনি শিবনাথ বাবু বেদী হইতে নামিলেন অমনি ব্রাহ্ম দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য পরমহংস মহাশয় একটু ব্যথিত ভাবে ডাকিলেন "ও শিবনাথ"! শিবনাথ বাবু অমনি "আজ্ঞা" বলিয়া পরমহংসের কাছে আসিয়া বসিলেন। তখন রামকৃষ্ণ উপস্থিত সকলের শিক্ষার জন্য একটু উচ্চ অথচ নরমসুরে বলিলেন "ভাই" তুমি যা উপদেশটী দিলে অতি সুন্দর। কিন্তু বিজয় পট পটীর ব্যবস্থা করিয়া রোগীর কাছে দই এবং তেঁতুল রাখা কি ভাই ভাল? তুমি যুবক যুবতীদের জিতেন্দ্রিয় হ'তে ব'লছ আবার যুবার কাছেই সুন্দরী যুবতীদের ব'সতে দিচ্ছ! হাঁহে শিবনাথ! রোগীর কাছে তেঁতুল দই থাকলে

যোগী যে লুকয়ে খাবে তা জাননা।" শিবনাথ বাবু চুপ করিয়া থাকিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদের এই সমস্ত বিশৃঙ্খল স্বাধীনতার ভাব দেখিয় বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন।

আর এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে কয়েকটি ব্রাহ্মিকা তাঁর সম্মুখে পুরুষোচিত কথোপকথন করায় (অর্থাৎ এমন ভাবে কথা কহিয়া ছিলেন তাহা স্ত্রীলোকের মত নহে) বিদায় কালে বিরক্ত হইয়া বলিয়া ছিলেন "তেমাদের আচরণ ও কথাবার্ত্তার আমার বোধ হয় ঈশ্বরের একটা বড় ভুল হইয়াছে। তিনি তোমাদিগকে যদি যোনি না দিয়া লিঙ্গ দিতেন তো বড় ভাল হইত"।

কেশবকে খুব স্নেহ করিতেন। এক দিন কেশবকে মিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন:—কেশব! তুমি ভাই সারে মাতে বেশ আছ। এদিকে ধর্ম্ম প্রচারক হয়ে বেদীতে বসে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছ। ওদিকে আবার বৎসরে বৎসরে ছেলে হইতেছে। তাই বলছি ভাই! তুমি সারে মাতে বেশ আছ। তা আর যেন? কেশব আমার একটা কথা শোন্—বুড় বয়সে রেড়ির কলটা বন্ধ করে দে"। শুনিতে শুনিতে কেশবের অনুতাপ এমনি প্রবল হইল যে সেই অবধি কেশব আর স্ত্রীর কাছে অধিক ক্ষণ থাকিতেন না। কেশব নাকি তার পর স্ত্রী সহবাস একবারে ত্যাগ করিয়া ছিলেন। ইহাতে বোধ হয় পরমহংস কেশব চন্দ্রের উপদেশের সঙ্গে বিশেষরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন।

আর একজন ব্রাহ্মকে সময় বিশেষে ধর্ম্মভাবে অত্যন্ত উন্মত্ত এবং সময় বিশেষে একবারে ধর্ম্মভাব বিহীন দেখিয়া দয়া করিয়া বলিয়া ছিলেন "হাঁরে তুই ভগবানের কাছে পাল

নিয়ে আবার পাল ঝেড়ে ফেলিস কেন?” সেই সরল ব্রাহ্ম এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলে রামকৃষ্ণ তাঁহার পৃষ্ঠে কর সঞ্চালন দ্বারা শক্তি সঞ্চার করেন। ইনি এখন একজন অসাধারণ ধর্ম্মবীর—ইনি ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়িয়া হিন্দু মতে সাধন করিতেছেন।

ব্রাহ্ম সমাজে রামকৃষ্ণের শক্তি যে বিশেষ কার্য্য করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রামকৃষ্ণের জাতিভেদ।



আচার ব্যবহার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি যার তার হাতে খাইতেন না; যার তার সঙ্গে একাসনে বসিতেন না। সংস্পর্শ দোষ বিষয়ে তাঁর তীব্র দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তা বলিয়া আমাদের মত বংশগত জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, অসচ্চরিত্র ব্রাহ্মণের হাতে জলস্পর্শ করেন নাই কিন্তু সচ্চরিত্র কায়স্থের হাতে জল স্পর্শ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটী বড় নিগূঢ় কথা আছে। জাতিভেদের ভিত্তি অতি গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠীত। সকল দ্রব্যের ভিতর হইতে একপ্রকার অতিসূক্ষ্ম পদার্থ বাহির হয়। যে বস্তুর যে রূপ প্রকৃতি তদ্বস্তু নির্গত উক্ত সূক্ষ্ম পদার্থ সেই রূপ প্রকৃতি জীবমধ্যে সংক্রামিত করে। ইহাকে ইংরাজীতে “Animal magnetism” বলে। ইহার শক্তি অতি

প্রখর। আমাদের প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া অলক্ষিত ভাবে উহার পরিবর্তন সাধন করে। স্থূল চক্ষে তাহা দেখিতে পাইনা বলিয়া আমরা সংস্পর্শ দোষকে দোষ বলিয়া বুঝিতে পারিনা। এইজন্য বর্তমান ইংরাজী শিক্ষিত গণ অনেকেই হিন্দুর জাতি ভেদের গভীর রহস্য বুঝিতে পারেননা। কিন্তু বুঝিতে পারি বা নাপারি, যাহা সত্য তাহা চির কালই সত্য। বর্তমান সময়ে ইউরোপে অনেক পণ্ডিত এ কথা বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই সংস্পর্শ দোষ লইয়াই হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব। যেমন মানুষের সঙ্গদোষে মানুষ খারাপ হয়, সদ্গুণে মানুষ ভাল হয়, সেইরূপ দ্রব্যাদির সংস্পর্শানুসারে মানুষের মন পরিবর্তিত হয় এইজন্য যা তা খাওয়া ভাল নয় ; যার তার সঙ্গে মেশা ভাল নয়—বসা ভাল নয় ; এই জন্য ব্রাহ্মণের শূদ্রের সহিত একাসনে বসা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ এই সূক্ষ্ম বস্তুর প্রভাব যাবতীয় বস্তুতে দেখিয়া অশন বসন উপবেশন শয়ন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইয়া ছিলেন। ইঁহারা দিব্য জ্ঞানে পরমাণুর শ্রেণী বিভাগ করিলেন। সাত্বিক পরমাণু, রাজসিক পরমাণু ও তামসিক পরমাণু। যে বস্তুতে রাজসিক ও তামসিক পরমাণু অধিক তাহার সংস্পর্শ ছাড়িতে বলিলেন। খাদ্যের ব্যাবস্থা উক্ত ভাব অনুসারে বিহিত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। বৃক্ষমধ্যে সাত্বিক বৃক্ষের নির্ব্বাচন করিলেন ; পুষ্প মধ্যে সাত্বিক পুষ্পের নির্ব্বাচন করিলেন; প্রদেশ মধ্যে তীর্থ সকলের নির্দ্দেশ করিলেন। এইজন্য বিল্ব, অশ্বত্থ, বট, তুলসী, নিম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ পবিত্র ; পুষ্পের মধ্যে জবা, করবি, অপরাজিতা, প্রভৃতি ফুল অতি পবিত্র

এই জন্য সবস্থলে পূজা হয়না, প্রদেশাদির মধ্যে কাশী গয়া বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ।

রামকৃষ্ণ পরম হংস হইলেও, লোক শিক্ষার জন্য সংস্পর্শ দোষ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া ছিলেন। সংস্পর্শ বিষয়ে তাঁর কি প্রকার ভাব ছিল নিম্ন লিখিত দুটী ঘটনা দ্বারা পাঠক গণ বুঝিতে পারিবেন:—

(১) এক সময়ে কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রামকৃষ্ণ সশিষ্য সঙ্কির্ত্তনে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। সেখানে বসিয়া তৃষ্ণা পাইলে এক গ্লাস জল চাহিলেন। নিমন্ত্রণ কারীর ভ্রাতা তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল আনিয়া উপস্থিত হইলে, অন্তর্যামী রামকৃষ্ণ উক্ত ব্যক্তির দুশ্চরিত্রতা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "রাখ রাখ তুই রাখ—তোকে কে জল আনতে বলেছে?" সেইখানে কায়স্থ বিবেকানন্দ বসিয়াছিলেন, তখন সেই দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া কহিলেন "নরেন! একগ্লাস জল আন"। রামকৃষ্ণ দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণের হাতে জল খাইলেন না সচ্চরিত্র কায়স্থের হাতে জল খাইলেন।

(২) এক সময়ে রামকৃষ্ণ সঙ্গোপাঙ্গ সহিত আপনার কুটীরে বসিয়া আছেন, এমন সময় বালী নিবাসী কোন ব্রাহ্মণ যুবা (এম এ) রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া নিকটে বসিলেন। এই যুবা সেই খানে বসিয়া নাস্তিকতার সমর্থন করিয়া অনেক কথা কহিলেন। এই নাস্তিক ব্রাহ্মণ উঠিয়া যাইলে রামকৃষ্ণ শিষ্য দিগকে বলিলেন "বাবা নাস্তিক এসে-ছিল! সব বিছানা তুলিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দাও, আর

পঞ্চাশ ঘড়া গঙ্গা জল দিয়া ঘর ধুইয়া ফেল"। তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিছানা গঙ্গার জলে ফেলা হইল এবং পঞ্চাশ ঘড়া গঙ্গাজল দিয়া ঘর ধৌত করা হইল।

রামকৃষ্ণের গুরু শিষ্য ভাব।

রামকৃষ্ণ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুকে গুরুজ্ঞানে প্রণাম করিতেন। উপরে যে নীল আকাশ তাহা যেমন তাঁর গুরু নিম্নে পদতলে একটী তৃণ—একটী বালু কণা তেমনি তাঁর গুরু। যে চন্দন দেবতার মস্তকে যায় তাহা রামকৃষ্ণের গুরু আর যে বিষ্ঠা মানুষের অতি ঘৃণিত তাহাও রামকৃষ্ণের গুরু। রামকৃষ্ণ কাহারও গুরু নহেন —তাঁর সকলেই গুরু। তবে তিনি যে উপদেশ দিতেন সে তাঁর উপদেশ নহে—ভগবান রামকৃষ্ণের ভিতর হইতে উপদেশ দিতেন। যাঁহারা সেই বস্তুকে পাইয়াছেন তাঁহারা আপনার বলিয়া, কিছুই রাখেন নাই। আপনাদের দেহ, মন, ইন্দ্রিয় সবই তাঁরে দিয়াছেন সুতরাং তিনি যখন কণ্ঠ হইতে ধ্বনি তোলেন—জিহ্বাকে সঞ্চালিত করিয়া উপদেশ দেন তখন সেই সাধু গুরুরূপে আচার্য্যরূপে জন সমাজের নিকট উপস্থিত হয়েন। এজন্য সাধুদিগের একটী সামান্য কথার প্রভাবে বড় বড় পণ্ডিতের রাশি রাশি গ্রন্থ বিনষ্ট হয়—সাধুর একটী বাক্যের জোরে পৃথিবী তোলপাড়

হয়। যাহা মানুষের তাহা থাকেনা—যাহা ভগবানের তাহা চিরকাল থাকে—বিনষ্ট হয়না। রামপ্রসাদের গানে মা কালীর শক্তিফুটিয়াছে এইজন্য চিরকাল থাকিবে। রামকৃষ্ণের উপদেশে ভগবানের কথা বাহির হইয়াছে, তাই চিরকাল থাকিবে। যে বৈজ্ঞানিকের ভিতর হইতে ভগবান কার্য্য করেন, সেই বৈজ্ঞানিকই নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারেন;—এরূপ বৈজ্ঞানিকের একটী কথা সমস্ত পৃথিবীর বিপক্ষতা পরাজয় করিয়া পরিশেষে আপনার চিরস্থায়ী জয়পতাকা উড্ডীন করে। ঈশ্বর যেমন অপরিবর্ত্তনীয় তাঁর যাহা সবই অপরিবর্ত্তনীয়। আকাশের সূর্য্য চন্দ্র যেমন তাঁর চিরকাল আছে যে ব্যক্তির উপদেশে ভগবানের কথা বাহির হইয়াছে, সে উপদেশ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় চিরকাল থাকিবে।

রামকৃষ্ণ শিষ্যভাবে আসিয়াছিলেন, শিষ্যভাবে গিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাতে ঐশী শক্তির প্রকাশ দেখিয়া গুরু বলিয়া ধরিয়াছেন, রামকৃষ্ণ তাঁর কালীর মার পদতলে তাঁহাদিগের চির আশ্রয় দেখাইয়া দিয়া—মার হস্তে তাহাদের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ইহাঁদের উপকারের জন্য, শিক্ষার জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন সবই মার আদেশে আপনার ইচ্ছায় আদতে নহে। রামকৃষ্ণ শিষ্যদের "নাম" দিয়াছেন কিন্তু কাণে মন্ত্র কাহারও দেন নাই। তবে শক্তি সঞ্চার করিয়া গুরুদীক্ষার কার্য্য করিয়াছেন। কাহারও বুকে হাত বুলাইয়া দিয়াছেন; কাহাকেও স্বপ্নে উপদেশ দিয়াছেন, কাহাকেও কোন খাদ্য দ্রব্য নিজহাতে খাওয়াইয়াছেন। রামকৃষ্ণের পদতলে যাঁহারা আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁদের কাহাকেও

কঠিন সাধনা দেন নাই। যাহা অতি সহজ এরূপ সাধনা দিয়াছেন। কোন কোন শিষ্যের সাধন ভজনের সমস্ত ভার লইয়া শিষ্যকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। এরূপ গুরু যিনি লাভ করেন তিনি ধন্য; কারণ গুরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরই ধর্ম্ম জীবন লাভের মূল মন্ত্র। ইহা যার আছে তার সবই আছে।

"গুরুকে যে করে মনুষ্য জ্ঞান।
কভু নাহি হয় তার ভজন সাধন॥"

ধর্ম্ম গুরুর উপরে কেহ নাই। তন্ত্রে আছে শিব রাগিলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রাগিলে কে রক্ষা করিবে? গুরু অপেক্ষা শিষ্যের আর কেহ আপনার নাই। শিষ্যের উদ্ধার না হইলে গুরুর উদ্ধার নাই। বিপদে গুরু শিষ্যকে রক্ষা করেন, মৃত্যুকালে আপনার চরণতরি দিয়া ভবসাগর পার করেন;—এজন্য গুরুর উপরে আর কেহ নাই। রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁর কোন কোন শিষ্য ঘোর বিপদ হইতে কিরূপে রক্ষিত হইয়াছেন পাঠকগণ শুনিলে "গুরু যে কি বস্তু" বুঝিতে পারিবেন।

(১) শ্রীযুক্ত————————————। কোন বড় মানুষের বাড়ীর একটী সুন্দরী যুবতীকে বাহির করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। ভোরবেলা বাড়ীর সামনে ঘোড়ার গাড়ী লইয়া উপস্থিত। স্ত্রীলোকটী বাটী হইতে পলাইবার জন্য গহনাপত্রের পুটুলি বাঁধিতেছে। শ্রীযুক্ত গাড়ির ভিতরে বসিয়া যুবতীর অপেক্ষায় আছেন। রামকৃষ্ণ শেষরাত্রে উঠিয়া তাড়াতাড়ি পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় ছুটিয়াছেন। রামকৃষ্ণের শিষ্য পাপ প্রলোভনের বিপদে

পড়িয়াছে—গুরু ভিন্ন কে রক্ষা করিবে? গুরু যদি এ বিপদে শিষ্যকে না বাঁচান তো শিষ্যের পাপ গুরুকে বহন করিতে হইবে। সুতরাং উহা শিষ্যের বিপদ নহে, গুরুর বিপদ। তাই রামকৃষ্ণ দ্রুতবেগে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া যাইতেছেন। রামকৃষ্ণ গাড়ীর কাছে আসিবা মাত্র শিষ্য চমকিয়া উঠিলেন—গুরু বেগে ধাবিত হইয়া শিষ্যের হাত ধরিয়া টানিলেন। শিষ্য গুড় গুড় করিয়া নামিয়া গেলেন। কয়েকদিন পরেই সেই শিষ্য একবারে নবজীবন লাভ করিলেন—এখন ইঁহার সহবাসে কত পাপী ধর্ম্মপথে ফিরিতেছে।

(২) শ্রীযুক্ত————। রামকৃষ্ণের পদাশ্রয় লইবার পূর্ব্বে। সোনাগাছির কোন বেশ্যার বাড়ী প্রবেশ করিয়াছেন। এই বেশ্যা কোন ধনীর রক্ষিতা। শ্রীযুক্ত ফাঁকি দিয়া সময়ে সময়ে সম্ভোগ করিয়া গোপনে গোপনে পলায়ন করেন। ধনীব্যক্তি একদিন জানিতে পারিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টায় থাকে। একদিন রাত্রিশেষে অনেক লোক লইয়া বাড়ী ঘেরিয়া ফেলিল। তখন শ্রীযুক্ত বড় বিপদে পড়িলেন। বেশ্যাটী তাহাকে নীচে পাতকো তলায় যাইতে বলিলেন। শ্রীযুক্ত পাতকোর কাছে গিয়া ভয়ে কাঁপিতেছেন—লোক গুলা বেশ্যার এঘর ওঘর খুঁজিয়া যখন পাতকোর দিকে আসিতেছে তখন শ্রীযুক্তের আত্মাপক্ষি উড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে—কাতর প্রাণে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছে—এমন সময়ে কে একজন আসিয়া তাহাকে বুকে করিয়া পাতকোর ভিতরে নামিয়া পড়িলেন। শ্রীযুক্ত প্রথমে শত্রু ভাবিয়া ছিলেন—কিন্তু সেই ব্যক্তি পাতকোর ভিতরে বুকে ধরিয়া যখন দাঁড়াইলেন এবং

দাঁড়াইয়া বলিলেন "আমি তোর গুরু—একদিন আমার আশ্রয় তোকে লইতে হবে; তোর আজ প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা, বুঝিতে পারিয়া আমি অলৌকিক ভাবে শূন্যপথে আসিয়াছি—কিন্তু ভয় নাই। সব লোক চলিয়া যাইলে, তোকে রাজপথে ছাড়িয়া দিব।" শ্রীযুক্ত তো সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। কয়েক বৎসর পরে যখন ইনি রামকৃষ্ণের দর্শন পান তখন ইনিই সেই রাত্রের মহাপুরুষ চিনিতে পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উহাঁর পা জড়াইয়া ধরেন।

রামকৃষ্ণের কপট ভাব।



সিদ্ধপুরুষেরা বড় কপট ভাবে থাকেন। এই জন্য সাধারণ লোকেরা বড় বুঝিতে পারে না। ইহাঁরা কপটী হইয়া আপনাদিগকে নিরাপদ রাখেন। নহিলে লোকের ভিড়ে, হাঙ্গামায় পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি করিয়া পলাইতে হয়। ইহাঁরা সংসারিক বিষয়াসক্ত লোকের নিকটে আপনাদিগকে উন্মাদবৎ প্রকাশ করেন। সংসারি লোকে সংসারের প্রত্যাশায় ঘুরিতেছে—টাকা টাকা করিয়া পাগল হইয়াছে—গুরুর পেটটী ভাল করিয়া ভরাইতে পারিলেই ইহাঁরা পরিতুষ্ট। এরূপ লোকেরা যদি জানিতে পারে যে অমুক ব্যক্তির কাছে গেলে সহজে মনস্কামনা পূর্ণ হয়, ডাক্তার কবিরাজের খরচ বাঁচিয়া যায়, বন্ধ্যা স্ত্রীর সন্তান হয়, তাহা হইলে সংসারি বিষয়াসক্ত লোকের ভিড়ে

পড়িয়া দুদিন টীকিতে পারেন কি না সন্দেহ। এই সময় পাপাসক্ত লোকের সংস্পর্শে ইহাঁদের এত সাধনার ফল বিনষ্ট হয়। এইজন্য সিদ্ধপুরুষেরা বড় কপট ভাবে থাকেন। তবে যাঁহারা সংসারে বিরক্ত হইয়া সংসারিক মান সম্ভ্রমকে অসার জ্ঞানে পরিত্রানের পথ জানিবার জন্য যান তাঁহাদের কাছে আপনাদের প্রকৃত ভাব ইহাঁরা প্রকাশ করেন।

রামকৃষ্ণের নাম জাহির হইলে দলে দলে ইহাঁর কাছে লোক আসিতে লাগিল। কেহ টাকা উপায়ের প্রণালী শুনিতে আসেন; কেহ রোগ আরাম করিবার জন্য আসেন; কেহ ছেলে হবার ঔষধের জন্য আসেন। এই সব লোকের নিকট রামকৃষ্ণ আপনার ঐশী শক্তির প্রকাশ করেন নাই। ইহাঁদিগকে নানারূপ উল্টা কথায় আপনার অসারত্ব বুঝাইয়া বিদায় করেন।

একদিন রামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। নিকটে কয়েকজন ব্রাহ্ম সমাজের লোক। দূরে একটী লোক আসিতেছে। লোকটী নাস্তিক। রামকৃষ্ণের ঐশীশক্তির পরীক্ষার জন্য আসিতে-ছেন। রামকৃষ্ণ দূর হইতে লোকটীকে দেখিবামাত্র সব বুঝিতে পারিয়া একজন ব্রাহ্মকে বলিলেন, "ঐ এক জন আসিতেছেন আমার পরীক্ষা করিতে। লোকটী সাধু মহাত্মাদের প্রতি আদতে ভক্তি করেনা—বুঝিয়াছে কেবল টাকা আর ইন্দ্রিয় সুখ—এই সব লোক কেন আসে? মার এসব পরীক্ষা। যাহা হউক লোকটীকে তাড়াইতে হবে"। বলিতে বলিতে লোকটী সন্নিকট প্রায়। তখন রামকৃষ্ণ কপটতা ধরিলেন। দুচক্ষু মুদিলেন এবং শব্দ করিতে লাগিলেন, "ভুড়-ভুড়-ভুড়ুক।

ভুড়-ভুড়-ভুড়ুৎ। ফুড় ফুড়-ফুড়ুৎ। কুড়-কুড়-কুড়ুৎ। আমাকে ভূতে পায় না কি? তোরা একটা রোজা টোজা এনে দেখা-দিনা? লোকে ভাবে আমি বড় সাধু—আমার যে মাথার অসুখ তা জানেনা আমি যে পাগল, তা বোঝেনা। ভুড়-ভুড়-ভুড়ুৎ। ফুড়-ফুড়-ফুড়ুৎ। কুড়-কুড়-কুড়ুৎ।

সেই ভদ্রলোকটী নিকট হইতে এইসব শুনিতে শুনিতে বড় সন্তুষ্ট হইল। কাছে আসিয়া বসিল। বসিয়া বলিল "আপনার যে মাথার ব্যায়রাম তা আমি অনেক দিন হইতে বুঝিয়াছি; অনেককে বুঝাইয়াছি। কারণ স্ত্রীকে মা বলিয়া ডাকা সহজ জ্ঞানে হয়না। মহাশয় কবিরাজী চিকিৎসা করাইলে আরাম হইতে পারেন"। রামকৃষ্ণ যে এক জন অসার পাগল ইহা স্থির করিয়া ভদ্রলোক উঠিয়া গেল। পৃথিবীতে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। ধর্ম্ম পিপাসায় যাঁরা অধীর তাঁরাই এরূপ লোকদিগকে চেনেন—কাছে বসিয়া উত্তপ্ত প্রাণকে শীতল করেন।

যে দক্ষিণেশ্বরকে রামকৃষ্ণ পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন সে দক্ষিণেশ্বরের অনেকেই রামকৃষ্ণকে পাগল বলিয়া জানে।



বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়।



শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশজাত সাধু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। বিজয় বাবু তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। সর্ব্বদা রামকৃষ্ণের নিকট যাইতেন উপদেশ লইতেন। রামকৃষ্ণের মাতৃভাব বিজয় কৃষ্ণের জীবনকে আচ্ছন্ন করিল। বিজয় বাবু সেই মাতৃভাবের ঢেউ লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মদিগের নিরস প্রাণকে প্লাবিত করিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের বেদি হইতে যখন বিজয় বাবু 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতেন তখন সকলের হৃদয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলিতে থাকিত। রামকৃষ্ণের মাতৃভাবে বিজয় কৃষ্ণের ভিতর দিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম দিগকে উন্মত্ত করিয়া ফেলিল। আজ বিজয় বাবুও চলিয়া আসিয়াছেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও একবারে নিরস হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যাহা জীবন সেই সঙ্গে গিয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন "ব্রাহ্ম-দলের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মদর্শন বিজয়ের হইয়াছে।"

বিজয় বাবুকে একদিন উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন "বিজয় তুই হুড়কোমি করিস কেন? ভগবানকে নিয়ে বেরয়ে যাবি তো একবারে যা"। বিজয় বাবু সেই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেছেন। এখন বিজয় বাবুর সেই অবস্থা দেখিলে মনে হয় রামকৃষ্ণের সেই অমূল্য উপদেশ সম্পূর্ণরূপে ফলিয়াছে।

বিজয় বাবুকে একদিন রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন "আচ্ছা ভাই! ষোল আনা মানুষ কোথাও কি দেখিয়াছ?"

বিজয় বাবু তখন আনন্দের সহিত উত্তর করিলেন "দুআনা, চার আনা, আট আনা অনেক দেখিয়াছি কিন্তু প্রভু ষোল আনা মানুষ একজন দেখিয়াছি।"

রামকৃষ্ণ—"কোথায়?"

বি——"প্রভু আপনাতেই দেখিয়াছি" বলিয়াই বিজয় বাবু ভক্তিভরে রামকৃষ্ণের পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। তখন রাম কৃষ্ণ বালকের ন্যায় আনন্দোন্মত্ত হইয়া কহিলেন "দেখেছিস! দেখেছিস!"

কেশব বাবুর সহিত বিবাদ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর বিজয়বাবু একদিন রামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন; এমন সময়ে কেশব বাবুর ষ্টিমার ঘাটে আসিয়া পঁহুছিল। কেশব বাবুর এক বন্ধু ষ্টিমার হইতে নামিয়া পরমহংস মহাশয়কে ডাকিতে আসিলেন। পরম হংসের ঘরে বিজয় বাবুকে দেখিয়া বাবুটী একটু "থত মত" খাইয়া গেলেন—ঘরের ভিতর প্রবেশ না করিয়া দরজার কাছ হইতে ডাকিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ ভিতরের কথা সব বুঝিতে পারিলেন; কেশব বাবুর সহিত বিজয় বাবুর মিলন করিবার সঙ্কল্প করিয়া বিজয় বাবুকে সঙ্গে করিয়া ষ্টিমারে লইয়া গেলেন। বিজয় বাবুকে ষ্টিমারে দেখিয়া কেশব বাবু আলাপ করিলেন না। রামকৃষ্ণ আলাপ করিয়া দিলে দুজনে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। কেশব বিজয়ে মিলন হইল দেখিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মদের মনটা খারাপ হইয়া গেল। ইহা বুঝিতে পারিয়া কেশবকে শুনাইয়া রামকৃষ্ণ

বলিলেন "শিবে রামে তো মিলন হইল; কিন্তু বানরে ভূতে মিলন হয়না কেন?"

সঙ্কীর্ত্তনের সময় যখন রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন তখনকার সৌন্দর্য্যের কথা মনে হইলে নিরস প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়।

রামকৃষ্ণের জীবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব।

গোঁড়া হিন্দুরা উপরের পংক্তিটী পাঠ করিয়া চটিবেন। হয়তো ভাবিবেন এ বই না পড়াই ভাল। যাঁহারা এরূপ ভাবেন তাঁহারা না হয় এ অধ্যায়টী বাদ দিয়া পড়িবেন। ইতিহাস লেখককে প্রকৃত কথা লিখিতে হয়। এ দেশে যদি ব্রাহ্মসমাজ না আসিত সব ভাল ভাল লোক খ্রীষ্টান হইয়া যাইত। রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, বাবু লালবিহারি দে, বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের মতন প্রতিভাশালী লোকেরা যে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য হিন্দুসমাজের দোষ দিতে হয়। কারণ ধর্ম্মপিপাসু যুবকগণের ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ করিবার কোন আয়োজন যদি হিন্দুসমাজে থাকিত তো উঁহারা এমন অমৃতের সাগর ছাড়িয়া গুড়ের কলসে যাইতেন না। হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার ভার যে ব্রাহ্মণদিগের উপরে ছিল, তাঁহারা

পূজার চাল কলা ও হোমের ঘৃতের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া ঈশ্বরের পূজা সমাপন করিতেছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সমুদয় ভাল কথা আছে তাহা তাঁহারা বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহারা যদি বুঝাইয়া দিতে পারিতেন তো হিন্দুসমাজ অতবড় রত্নদিগকে হারাইতেন না। ব্রাহ্মসমাজ আসিয়া যখন হিন্দুধর্ম্মের গভীরভাব বুঝাইতে লাগিলেন তখন খ্রীষ্টানরা পর্য্যন্ত ভয় পাইয়াগেলেন! আদি ব্রাহ্মসমাজে যখন বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত ধর্ম্মভাবের কথা প্রচার করিলেন তখন দেশের চিন্তাশীল লোকসকল খ্রীষ্টানী ধর্ম্মের দিকে আর ঝুঁকিলেন না। উপনিষদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাবু অক্ষয়কুমারই সর্ব্ব প্রথমে রাজা রাম-মোহন রায়কে বুঝিতে পারেন, বুঝিয়া তাঁহার সার্ব্বভৌমিক ভাব তেজস্বিনী ভাষায় প্রচার করেন। তখন রাজা রামমোহন রায়কে ভারতবর্ষে কেহই বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম নেতাগণ রামমোহন রায়ের প্রকৃত ভাব না বুঝিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে একটী গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া-ছিলেন। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আপনার অসামান্য প্রতিভাবলে সকলকে বিচারে পরাস্ত করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মকে বজ্রগম্ভীর ভাষায় প্রচার করিলেন। যে রামমোহন রায়ের মত লোক পৃথিবীর কোন দেশে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ—যিনি মৃত হিন্দু জাতির পুনরুত্থানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন; সেই মহাপুরুষের মহাভাব হয়তো বিনষ্ট হইয়া যাইত, যদি অক্ষয় বাবু তাঁহাকে প্রচার না করি-

তেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটী অক্ষয় বাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি।* সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং যাবতীয় ধর্ম্মের শুদ্ধভাব গ্রহণ—এ দুটী কার্য্য পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ই সমাধা করেন। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত উক্ত ভাব গভীর যুক্তি দ্বারা স্বদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে হৃদয়ঙ্গম করান। যদি রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত শিষ্য কেহ থাকেন তো সে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত। ব্রাহ্ম দলের মধ্যে যদি কেহ রাজা রামমোহন রায়কে সম্যকরূপে বুঝিয়া থাকেন তো সে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত।

রামকৃষ্ণ পরম হংস আদি ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন ব্রাহ্মদিগের উপদেশ শুনিতেন। এই সকল উপদেশ শুনিয়া তাঁর মনে সর্ব্ব-ধর্ম্ম সাধনার ভাব প্রবল হয়। একথা উড়াইতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম লইয়া যে কাণ্ড পৃথিবীতে চলিতেছে তাহার গোড়া রাজা রামমোন রায়। পারসী আরবি ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থকার বিশেষের গ্রন্থ হইতে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল বটে। ভলটিয়ার ভলনি প্রভৃতির পুস্তক রাজার জীবনে এ সম্বন্ধে বিশেষ রূপ কার্য্য করিয়াছিল বটে। কিন্তু একটী অতি প্রবল শক্তিকে অবলম্বন করিয়া, আপনার জীবনকে মৃত্যুমুখে পতিত করিয়া, বীর পুরুষের ন্যায় সকল সম্প্রদায়ের

---

* বঙ্গদেশে রাজা রামমোহন রায়ের পরই অক্ষয় বাবুর সিংহাসন। ৩৫ বৎসর বয়সেই ভীষণ মস্তিষ্করোগে অকর্ম্মণ্য হইলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁর মত শক্তিশালী কেহই নহেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহঁার অদ্বিতীয় প্রভাব।

বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াইয়া, আয়ের গিরির অযুদ্দমের ন্যায় সেই সকল ভাব পৃথিবীতে প্রচার করিতে রাজা রামমোহন রায়ই সর্ব্ব প্রথমে পৃথিবীতে দণ্ডায়মান হন। রাজা রামমোহন রায় যে ভাব কথা দ্বারা প্রচার করেন সে সব ভাব রক্তমাংসে পরিণত করিয়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস, পৃথিবীকে প্রদর্শন করিলেন। রাজা রামমোহন রায় বাক্যবীর এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস কর্ম্মবীর। প্রেমের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস যাহা বাক্যে প্রকাশ করিলেন চৈতন্যদেব তাহা জীবনে দেখাইলেন। বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস বাক্যবীর আর শ্রীচৈতন্য কর্ম্মবীর। ইটালীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে ম্যাটসিনী বাক্যবীর এবং গ্যারিবল্ডি কর্ম্মবীর কিন্তু বাক্যবীর না হইলে কর্ম্মবীর হয় না। দেশে আগে বাক্যবীর আসিয়া আগ্নতুল্য বাক্যে মানুষকে উত্তেজিত করে—সেই উত্তেজনা হইতে কর্ম্মবীরের জন্ম হয়। বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস আগে না আসিলে চৈতন্য কখনও আসিতেন না ম্যাটসিনির জন্ম না হইলে শত গ্যারিবল্ডিতেও ইটালীর কিছুই করিতে পারিত না। রাজা রামমোহন, বাবু অক্ষয়কুমার না আসিলে এমন মধুর রামকৃষ্ণের জীবন আমরা পাইতাম না। অধঃপতিত দেশকে তুলিতে হইলে প্রথমে উত্তেজক বাক্য চাই,—হেম বাবুর ভারত সঙ্গীতের মত উদ্দীপক গান চাই, বক্তৃতা চাই। এই গান বক্তৃতা শুনিয়া দেশের রক্ত যখন খরতর বহিতে থাকে—ধমনী যখন নাচিতে থাকে, সেই জাতীয় ধমনীর মধ্যবিন্দু হইতে কর্ম্মবীরের জন্ম হয়। এই জন্যই

বলিতেছি বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাসের * সহিত শ্রীচৈতন্যের জীবনের যে সম্বন্ধ, ম্যাটসিনির সহিত গ্যারিবল্ডির জীবনের যে সম্বন্ধ; অথবা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমাদের রামকৃষ্ণের সেই সম্বন্ধ।

ভট্টাচার্য্য রহস্য।

একদিন রামকৃষ্ণ কোন্নগরে কোন ভক্তের বাড়ী গিয়া বৈটকখানায় বসিয়া আছেন। পাড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বৈটকখানায় নানাবিধ ধর্ম্মালাপ হইতেছে। অনেকে ভক্তির সহিত রামকৃষ্ণের উপদেশ শুনিতেছেন। এমন সময়ে কোন্নগরের সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার নাম করিবার প্রয়োজন নাই—ইনি কোন্নগরের তখন সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত।

মানুষ মানুষকে নানা প্রকারে হিংসা করে। রামকৃষ্ণ পথের কাঙাল। তথাপি তাঁর প্রতি মানুষের—পণ্ডিতের হিংসা কেন? কারণ পথের কাঙাল হইয়া কত ধনীলোককে যে নিজগুণে পদতলে আকর্ষণ করিয়াছেন—পথের কাঙালের

---

* ইহাদের পুস্তকে গভীর প্রেমের এমন সব পবিত্র কথা আছে পৃথিবীর আর কোন দেশের সাহিত্যে সে সব নাই। অশ্লীলভাবে যাহারা অর্থ করেন তাঁহারা এসব অমৃতের অধিকারী নহেন—কারণ অশ্লীলভাব এসব পুস্তকে আদতে নাই। গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারি না তাই অশ্লীল বোধ হয়।

যে সম্মান, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এত শাস্ত্র পড়িয়াও যে তার এক কণাও পাইলেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মরিয়া ছাই হইবেন—তাঁর পাণ্ডিত্য নাম, সঙ্গে সঙ্গে ছাই হইবে। রামকৃষ্ণ মূর্খ—পথের কাঙ্গাল বটে কিন্তু অসাধারণ ভক্তির পাত্র হইয়া পৃথিবীকে চমকিত করিতেছেন—ইহা ভট্টাচার্য্যের প্রাণে সহিতেছে না। ভগবান যাহাকে বড় করিতেছেন—সমস্ত পৃথিবী চেষ্টা করিয়া তাহাকে ছোট করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে একটী ভাল গল্প আছে।

এক সময়ে নারদ ভগবানের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু! আপনাকে কখনও হাসিতে দেখি না কেন?" তাহাতে ভগবান বলিলেন "নারদ! আমি চারবার হাসি।" একবার হাসি, যখন ভাইএ ভাইএ বিবাদ করিয়া দড়ি ধরিয়া জমী বিভাগ করিবার কালে বলে "এটা আমার আর ওটা তোমার।"

২য় বার হাসি "যখন রোগী মরিতেছে এমন সময়ে ডাক্তার বলে, ভয় নাই আমি বাঁচাইব।"

তৃতীয়বার হাসি "যখন আমি মানুষকে বাড়াইতেছি তখন অন্যলোকে তাকে কমাইতে চেষ্টা করে।" আর চতুর্থবার হাসি "যখন আমি মানুষকে অপদস্থ করি আর মানুষ তার মান বাঁচাইবার চেষ্টা করে।"

ভগবান রামকৃষ্ণকে বাড়াইতেছেন তুমি দেশশুদ্ধ লোককে একত্র করিলেও কমাইতে পারিবে না। কিন্তু মানুষ তাহা আদতে বুঝে না—বাধা দিতে গিয়া আপনি অপদস্থ হয়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় রামকৃষ্ণের নাম ও সুখ্যাতি শুনিয়া হিংসায় জ্বলিতে জ্বলিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া পরমহংসকে প্রণাম বা নমস্কার কিছু করিলেন না। কিন্তু পরমহংস মহাশয়, আসিবামাত্র ভট্টাচার্য্যকে নমস্কার করিলেন, ভট্টাচার্য্য পাণ্ডিত্যাভিমানীস্থ—তরাং নমস্কার ফিরিয়া দিলেন না। কিন্তু শাকে মাছ ঢাকিবার জন্য অহংকারের পুঁটুলি খুলিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন "আপনি কি আমার নমস্য?" ভক্ত রামকৃষ্ণ বিনয়ের সহিত উত্তর করিলেন "এ জগতে আমার সকলেই নমস্য—আমি সকলের নীচ।"

প্রকৃত বিনয়ের সুর শুনিয়া ভট্টাচার্য্যের অহংকার একটু নরম হইল—সভার মধ্যে আপনাকে একটু অপদস্থ বোধ করিলেন। কিন্তু অহংকারটা কিছু আছে—তাই উভয় দিক বজায় রাখিয়া কহিলেন "আপনার পৈতা দেখিতেছি না তাই বলিতেছি। তবে যদি পরমহংস হনতো বলুন—তাহা হইলে প্রণাম করি। আমি কেমন করিয়া আপনাকে চিনিব বলুন, আপনার পরমহংসের বেশও তো দেখিতেছি না;—তাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি কি আমার নমস্য?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন "আমার ক্ষুধা পেলে খাই ঘুম পেলে ঘুমাই আমি পরমহংস কি না তা বলিতে পারি না।"

ইহা অপেক্ষা বিনয়ের কথা কি হইতে পারে? অহংকারী ভট্টাচার্য্য তখন বুঝিলেন, অভিমানপূর্ণ পাণ্ডিত্য অতি অসারপদার্থ।"

আর এক সময়ে রামকৃষ্ণ অনেকগুলি ভদ্রলোকের সহিত আপনার আশ্রমে বসিয়া আছেন; তখন অপরাহ্ন। এক ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরমহংস দেখিতে আসিলেন। আসিয়া জিজ্ঞাসা

করিতেছেন "মহাশয়! রামকৃষ্ণ পরমহংস কোথায়?" একজন রামকৃষ্ণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "এই ইনিও তিনি।"

ভট্টাচার্য্যের আক্কেল "গুড়ুম" হইল। কেন না, রামকৃষ্ণের কালাপেড়ে কাপড় গায়ে সাদা জামা—পরমহংসের কোন চিহ্নই নাই। ভট্টাচার্য্য চমকিতভাবে সেইখানে বসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "পরমহংসের কালাপেড়ে কাপড়—এতো শাস্ত্র বহির্ভূত কথা! বলিয়াই শাস্ত্রের শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তখন রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে রহস্যচ্ছলে "শুধু কালাপেড়ে কাপড় নয়—আবার বানিশ করা চটী দেখুন;" বলিয়াই স্বহস্তে আপনার জুতা জোড়াটী দেখাইলেন। তখন ভট্টাচার্য্য বলিলেন "আপনি তো খুব পরমহংস দেখছি—লোকগুলা কিছু বোঝে না শাস্ত্রে পরমহংসের লক্ষণ যে কি তা জানে না, অথচ পরমহংস পরমহংস করিয়া গোলমাল করে।" বলিয়া বিরক্তির সহিত উঠিয়াগেল।

তখন সন্ধ্যা উপস্থিত। ব্রাহ্মণ গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যায় বসিলেন। বসিয়া চক্ষু মুদিয়া যখনি ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করিতে যান অমনি সেই কালাপেড়ে ধুতি পরা রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতে পান। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে মূর্ত্তি তাড়াইতে পারেন না। তখন ব্রাহ্মণের জ্ঞান হইল, ইনি সামান্য মানুষ নহেন—ইনি ভগবান হইয়াছেন। আমি মহা অপরাধ করিয়াছি। ব্রাহ্মণ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে রামকৃষ্ণের দু পা জড়াইয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণের পা জড়াইয়া ধরায় রামকৃষ্ণ মহা বিপদে পড়িলেন—নানা কথায় ঠাণ্ডা করিয়া ব্রাহ্মণের হাত হইতে পা ছাড়াইলেন।

রামকৃষ্ণের তত্ত্বজ্ঞান।



পূর্ব্বে বলিয়াছি রামকৃষ্ণ আপনার প্রকৃতির প্রস্ফুটনের জন্য স্কুল, কলেজে যান নাই। সাধনা দ্বারা যাহা পাইয়াছেন তাহাই সাদা কথায় লোকের নিকট কহিয়াছেন। সে সাদা কথার উপদেশ শুনিয়া লোকে মোহিত হইয়াছেন। তুলসি-দাস, ও কবির যেমন অতি সরল পদ্যে আপনাদের সাধনা সম্ভূত জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন; রামকৃষ্ণ অতি সরল কথায় তত্ত্বজ্ঞানের গভীর কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এ সব কথার এতই শক্তি যে মহাপণ্ডিত টনি সাহেব অনেক উপদেশের অনুবাদ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

১। বেদ বল, বাইবেল বল, কোরাণ বল সবই অসার: ভগবানের কৃপাই সার।

২। যে ভগবানকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছে তার আর কিছু শিখিবার বাকি নাই; পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যা তার চরণধুলি পাইলে কৃতার্থ হইবে।

৩। ভগবানকে ভুলিয়া, যে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালের সমস্ত সুখ ভোগ করে সেই প্রকৃত হতভাগ্য ও দুঃখী; কিন্তু যে ভগবানকে স্মরণ করিয়া দিনান্তে শাকান্ন ভোজন করে সেই বাস্তবিক সুখী।

৪। যে বিদ্যা শিখিলে, মৃত্যুনদী পার হওয়া যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যাই সার জানিবে। এক ব্যক্তি নানা বিজ্ঞানে পারদর্শী। ইনি পদ্মা পার হইতেছিলেন। নৌকায় মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন "এই নদী কোথা হইতে আসিয়াছে জানিস ?"

"না বাবু"

"জোয়ার ভাঁটা কেন হয় জানিস ?"

"না বাবু"

"বাতাস বয় কেন জানিস ?"

"না বাবু আমরা চাষাভুষো লোক অতশত জানি না"—

"দূর ব্যাটারা ! খালি খাস ও ঘুমাস।" এ সব শিখিলে কত আনন্দ হয়। ইত্যাদি। বলিতে বলিতে ভয়ানক ঝড় উঠিল। নৌকা যায় যায়। মাঝিরা তখন "বাবু সাঁতার জানেন ? বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে "ওরে নারে না।" "এত শিখেছেন প্রাণ বাঁচাবার বিদ্যাটা শেখেন নাই—এখন আপনার সে সব বিদ্যাদের ডাকুন ;—আমরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ; আপনি এখন আপনার প্রাণ রক্ষা করুন," এই কথা বলিয়া মাঝিরা ঝাঁপ দিয়া সন্তরণ দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিল। বিদ্যাবান মহাশয় জলে ডুবিয়া মরিলেন। সবই শিখেছিলেন কেবল বাঁচিবার বিদ্যাটা শিখেন নাই।



ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের উপদেশ।



এক ঈশ্বরের অনন্তভাব; অনন্তরূপ অনন্ত নাম। যেমন এক মাটিতে হাঁড়ি হয়, কলসী হয়, প্রদীপ হয়, সেইরূপ এক ঈশ্বরের কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি অসংখ্য মূর্ত্তি। যেমন এক জলের নাম ওয়াটার, পানি, একোয়া; সেইরূপ এক ঈশ্বরের নানা নাম যথা;—গড্, জিহোবা, আল্লা প্রভৃতি। যেমন সমুদ্রের জলে সর্ব্বত্রই লবণ; সমুদ্রের জলকে জাল দিয়া জলকে উড়াইয়া দিলে লবণ পাওয়া যায়; সেইরূপ সাধনা দ্বারা জ্ঞানবলে সৃষ্টি হইতে মায়াকে উড়াইলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। যদি বল ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন দেখিতে পাই না কেন? চক্ষুযুক্ত ব্যক্তি জগতের চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা বিভূষিত আকাশ দেখে কিন্তু অন্ধ দেখিতে পায় না। তা বলিয়া কি বলিব চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা বিভূষিত আকাশ নাই। আকাশে অসংখ্য তারকা জ্বলিতেছে, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে আর তারকা দেখা যায় না; সেইরূপ হৃদয়াকাশে ভগবান আছেন, হৃদয় মায়াচ্ছন্ন বলিয়া সে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পানা পুকুরের ধারে দাঁড়াইয়া বলিতেছ সব পানা, জল কই? পানা সরাও জল দেখিতে পাইবে। সেইরূপ মায়াচ্ছন্ন সংসারের ধারে দাঁড়াইয়া বলিতেছ সবই মায়া ঈশ্বর কই? মায়া সরাও ঈশ্বর দেখিতে পাইবে। যেমন বড় মানুষের

ঘাড়ীর মেয়ে, চিকের আড়ালে থাকেন, কেহ দেখিতে পায় না কিন্তু তিনি বাহিরের সব দেখেন, সেইরূপ জগতের মা প্রকৃতির আড়ালে আছেন, তাঁকে কেহ দেখিতে পায় না কিন্তু তিনি সব দেখেন। আমাদের অহংরূপ চিকের আড়ালে মা লুকাইয়া আছেন; অহং তুলিয়া ফেলিলেই মায় কোলে গিয়া পড়া যায়।

তিনি আপনাকে না দেখাইলে কেহ দেখিতে পায় না। যেমন আঁধারে লণ্ঠনধারি পাহারাওয়ালা আপন লণ্ঠনের আড়ালে থাকিয়া সম্মুখের সবই দেখে, কিন্তু সম্মুখের কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না কেবল সেই আলোকই দেখে, সেইরূপ এই সূর্য্য চন্দ্রের জ্যোতির আড়ালে ভগবান লুকাইয়া আছেন; তিনি সব দেখেন তাঁহাকে কেহ দেখে না। আবার যেমন ঐ পাহারাওলা ইচ্ছা করিলে আলো সরাইয়া আপনাকে দেখায়, সেইরূপ ভগবান এই জগতের চন্দ্র সূর্য্যাদির আলোকের আড়াল হইতে আপনাকে দেখান।

ঈশ্বরকে যিনি একভাবে বলেন, তিনি ঐ ভাবে যা বলেন তা সত্য কিন্তু ঈশ্বরের অন্যান্য অসংখ্যভাবও আছে। যিনি যে ভাবে তাঁকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি সেইভাবে তাঁকে বলেন।

ঈশ্বরের প্রকৃতস্বরূপ কি? একবার উত্তর নাই। কোন শাস্ত্র এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্র সকলই তাঁকে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

জল জমিলে যেমন বরফ হয়, তেমনি চৈতন্য ঘন হইয়া সাকার ঈশ্বর হয়েন। সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বর একই বস্তু। যেমন ন্যাংটা আমি ও কাপড়পরা আমি। নিরাকার অদৃশ্য ঈশ্বরে যে বিশ্বাস—তাহা সামান্য বিশ্বাস কিন্তু সাকারে যে বিশ্বাস—তাহা বড় বিশ্বাস।



কাঁচা ও পাকা জ্ঞান।

কাঁচা জ্ঞান কল্পনায় বাস করে পাকা জ্ঞান জীবনে বাস করে যদি সবই ঈশ্বর তবে আর ভয় কি? কল্পনার জ্ঞান জীবনে পরিণত হইলে আর কিছু ভয় থাকে না।

গুরু বলিলেন, সবই নারায়ণ। শিষ্য তাই বুঝিলেন। পথের উপরে একটা হাতি আসিতেছিল, উপর হইতে মাহুত বলিতেছিল "সরে যাও"। শিষ্য ভাবিল সরিব কেন? হাতীও নারায়ণ আমিও নারায়ণ। নারায়ণের কাছে নারায়ণের ভয় কি? শিষ্য সরিল না। তখন হাতী শুঁড় দিয়া শিষ্যকে দূরে ফেলিয়া দিল। শিষ্যের শরীরে বড় লাগিল। শিষ্য কাতর ভাবে সব গুরুর কাছে নিবেদন করিল। তখন গুরু বলিলেন, ভাল বলেছ, তুমিও নারায়ণ হাতীও নারায়ণ কিন্তু উপর হইতে যে মাহুত নারায়ণ তোমায় সরিতে বলিয়াছিল সে কথা শুন নাই কেন?

এক গুরু তাঁর কোন রাজা শিষ্যকে বলিলেন সবই সমান। রাজা মহাশয় রাত্রে অন্দরে গিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, তুমিও যে আমার মেয়েও সে। আজ মেয়েকে লইয়া শুইব। স্ত্রী বলিলেন কাল যাহা হয় হবে। পরদিন রাণী গুরুর নিকটে গিয়া সব নিবেদন করিলেন। গুরু বলিলেন "আজ খাবার সময় তরকারির সঙ্গে একবাটী গু দিও।" রাণী তাহাই করিলেন। রাজা ভাতের কাছে গুর বাটী দেখিয়া রাগিয়া রাণীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রাণী বলিলেন "তোমার তো সব সমান জ্ঞান হইয়াছে—মাছের ঝোলও যা গুও তা; তবে রাগিতেছ কেন? রাজা মহাশয়ের তখন হুঁস হইল। বুঝিলেন "সমজ্ঞানটা" কথার কথা নহে।

সব বস্তু নারায়ণ বটে, কিন্তু সব বস্তু তুমি খাইতে পার না। তোমার ভিতর হইতে জ্ঞানরূপী নারায়ণ মাহুতের মত নিষেধ করিতেছে। যখন মাহুতরূপী নারায়ণ খাইতে বলিবে তখন খাইবে কোন বিপদ ঘটিবে না। সব বস্তু নারায়ণ এটা যতদিন শোনাজ্ঞান থাকিবে ততদিন কোন কাজে লাগিবে না। যখন সব বস্তুতে ব্রহ্ম দেখিবে তখন আর বিষ খাইতে নিষেধ নাই।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট দুই ব্যক্তি আসিয়া আশ্রয় লন। পিতা ও পুত্র। পিতা অপেক্ষা পুত্র জ্ঞানী। একদিন রামকৃষ্ণের ঘরের ভিতর হইতে একটী বিষধর সর্প বাহির হইয়া পুত্রকে কামড়াইল। পিতা ব্যস্ত হইলেন। রোজা আনিলেন। রোজা আনিয়া পুত্রকে ঝাড়াইবার জন্য ডাকিলেন—ঔষধ লইয়া খাইতে দিলেন। পুত্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কে

কাকে কামড়েছে?" পুত্র ঔষধও খাইলেন না—কিছুই হইল না।* এই যুবা যদি প্রহ্লাদের ন্যায় বিষ পান করিতেন, তো কিছুই হইত না।

প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান যাঁর হইয়াছে তাঁর আর দ্বিধাজ্ঞান নাই।

---

* আমি প্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা, শুনিয়াছি। আপনি জীবনে কিছু কি অলৌকিক দেখিয়াছেন? এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন :—যখন গাজিপুরের পাহাড়ি বাবাকে দেখিতে যাই। তখন তাঁর কাছে বসিয়া আছি এমন সময়ে এক বিষধর সর্প পিছন হইতে আসিয়া তাঁহাকে দংশন করিল। আমি দেখিবামাত্র "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।" সহর হইতে রোজা আনিবার জন্য উদ্যত। এমন অবস্থায় বাবাজি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভয় নাই বাবা। ভগবান কৃপা করিয়াছেন (ভগবানজি কৃপা কিয়া)।" বাবাজির কিছুই হইল না। সেই অবধি অসম্ভব বলিয়া আর কিছু মনে হয় না। আর একটী ঘটনা রামকৃষ্ণের মৃত্যুর দিন রতন বাবুর ঘাটে ঘটে। পরমহংসের দেহ সৎকারের পর, শ্মশানে একটী যুবাকে গোখরা সাপে কামড়াইল। যুবার সেই বিপদে একটা গোলমাল উঠিল। সকলে ভয় পাইল। মহিম বাবু সেদিনকার সকল বিষয়ের কর্ত্তা। সকলে মহিম বাবুকে জানাইল। মহিম বাবু বিশ্বাসের জোরে কহিলেন "রামকৃষ্ণ-শিষ্যের আবার সাপের ভয়? গঙ্গায় ডুব দাওগে সব যাবে।" যুবার প্রকৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান জাগ্রত হইল। গঙ্গা স্নানের পর সব আপদ কাটিয়াগেল।

এক জ্ঞানই জ্ঞান বহুজ্ঞান অজ্ঞান। এমন ব্যক্তি দেখেন, যেমন যাত্রায় এক মানুষ নানাবিধ সংসাজে, সেইরূপ এক ঈশ্বর নানাবিধ পদার্থ সাজিয়াছেন। তখন তিনি মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞানে ঈশ্বরবৎ ব্যবহার করেন। জীবজন্তু সমস্ত বস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞানে স্তম্ভিত হয়েন। গাছ দেখিয়া ভক্তিতে রোদন করেন, আকাশ দেখিয়া প্রেমে উন্মত্ত হন। তখন তিনি বলেন, "আমার ঈশ্বর এক মূর্তিতে গৃহস্থের কুলবধূ সতী, আর এক মূর্তিতে মেছোবাজারের খানকি ;" বলিতে বলিতে প্রেমোন্মত্ত হয়েন।

এক সময়ে রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনি স্ত্রী-সহবাস করেন না কেন ?" তাহাতে রামকৃষ্ণ এই উত্তর দেন :-- "এক সময়ে কার্তিক একটী বিড়ালের গালে আঁচড় দিয়াছিলেন। পরদিবস কার্তিক দেখিলেন, ভগবতীর গালে একটী আঁচড় রহিয়াছে। কার্তিক জিজ্ঞাসিলেন, "মা! তোমার গালে ও কিসের আঁচড় ?" ভগবতী বলিলেন, "বাবা! কাল যে তুমি বিড়ালের গালে আঁচড়াইয়াছিলে, সেই আঁচড় আমার গালে লাগিয়াছে।" কার্তিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "মা! বিড়ালের গালের আঁচড় তোমার গালে কি প্রকারে আসিল ?" তখন ভগবতী কহিলেন, "বাবা! জগতে যত জীব আছে, সব আমারই অংশ ; জীবকে কষ্ট দিলে, আমাকে কষ্ট দেওয়া হয়।" কার্তিক তারপর ভাবিলেন ; তবে আমার বিবাহ করা হবে না। কার্তিক সেই অবধি আইবুড় থাকিলেন। আমার সেই কথাটা মনে লাগায়, আমি আর স্ত্রী-সহবাস করিতে পারিনা। • • •

এইরূপ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর মানুষের জাতিভেদ থাকে না। যিনি ভেদাভেদ বর্জ্জিত তাঁর জাতিভেদ থাকিবে কি প্রকারে? তখন হাড়ি মুচি কেন? কুকুর শৃগালের সঙ্গে ভোজন করিলেও দোষ হয় না।

এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে রামকৃষ্ণের নিকট একটী পশ্চিমে সন্ন্যাসী আসেন। কালীবাড়ির বাহিরে একটী কুকুর, ফেলাভাত খাইতেছিল, দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "তুই একলা খাবি?" বলিয়াই তার সঙ্গে ভাত খাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তার প্রিয় শিষ্য হৃদয় মুখুজ্যেকে বলিলেন, "হৃদয়! ঐ সাধুর কাছ হইতে কিছু উপদেশ লওগে।" হৃদয় অমনি তাড়াতাড়ি গিয়া সাধুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" সাধু বলিলেন, যে দিন ঐ গঙ্গাজল আর এই খানার জল তোর সমান জ্ঞান হইবে, * এবং জগতের শব্দ ও হরি সঙ্কীর্ত্তনের শব্দ সমান জ্ঞান হইবে সেই দিন তোর মুক্তি হইবেক।

রামকৃষ্ণ বলিতেন, খোড়েরি মাজ—মাজেরি খোড়। ব্রহ্মই জগৎ—জগতই ব্রহ্ম। যাহা কিছু সবই তিনি। আমি যা করি, তুমি যা কর সবই তিনি। তবে কি পাপ করিব? যার পাপ করিবার ইচ্ছা আছে, তার আবার ব্রহ্মজ্ঞান কোথা? সে অজ্ঞানতার মহাপাপে নিমগ্ন। যার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, সে পাপ পুণ্যের অতীত হইয়াছে। তবে যার ব্রহ্মজ্ঞান শোনা, সে ওকথা বলিতে পারে—পাপ সর্ব্বদা করিতে পারে। ভগবান

* অর্থাৎ সব জলকে গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র জ্ঞান হবে।

যেমন তস্কররূপে চুরি করেন, সেইরূপ তিনি আবার বিচারক রূপে জেলে পাঠান। নিজেই তস্কর, নিজেই বিচারক, নিজেই জেল। রামকৃষ্ণ তাই বলিতেন :—

সাপ হ'য়ে খাই আমি রোজা হ'য়ে ঝাড়ি।
হাকিম হ'য়ে হুকুম দি পেয়াদা হয়ে মারি॥

মায়া না কাটিলে ব্রহ্মলাভ হয় না। ব্রহ্মলাভ না হইলে অদ্বৈত জ্ঞান হয় না। যার ব্রহ্মলাভ হইয়াছে, তার আর কোন প্রকার কুভাব মনে আসিতে পারে না।

নকলে ব্রহ্মজ্ঞান আসে না। শঙ্করাচার্য্য একদিন ইতর লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করেন। আহারের অবশিষ্ট অন্ন পথে ফেলিলে একটা কুকুর তাহা খাইতে আরম্ভ করে। শঙ্করের এক শিষ্য তাহা দেখিতে পাইয়া মনে মনে ভাবিল, আমিও যে কুকুরও সে আর এই যে অন্ন ইহা আমার গুরুর প্রসাদ। এই ভাবিয়া সেই শিষ্য কুকুরের সঙ্গে সেই অন্ন খাইতে লাগিল। পরিশেষে শঙ্কর যখন তাহা দেখিলেন তখন মনে মনে বিরক্ত হইয়া শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া এক কামার শালায় প্রবেশ করিলেন। একখানা উত্তপ্ত লৌহ খণ্ডের কিয়দংশ গিলিয়া অপরাংশ শিষ্যকে খাইতে বলিলেন। শিষ্য সেই উত্তপ্ত লাল লৌহখণ্ড দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তখন শঙ্কর কহিলেন, "এখনও সমান জ্ঞান তোমার হয় নাই—তাহা হইলে আমার মত উত্তপ্ত লৌহ খাইতে পারিতে।"

প্রকৃত অদ্বৈত জ্ঞান বুঝাইবার জন্য তিনি একটা গল্প বলিতেন :—শঙ্করের একটা শিষ্য ছিল। সে শঙ্করের খুব

সেবা করিত। শঙ্কর এপর্য্যন্ত তাঁহাকে একটীও উপদেশ দেন নাই। একদিন শঙ্কর বসিয়া আছেন তাঁহার সেই শিষ্য বাটীর বাহিরে খুব পদশব্দ করিয়া আসিতেছে, শঙ্কর তাহা শুনিতে পাইয়া একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কোন হ্যা?" শিষ্য কহিলেন, "হাম্।" তখন শঙ্কর একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার হাম্" যদি এত ভাল লাগে, হয় উহাকে বাড়াইয়া সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্ন কর, না হয় উহাকে একবারে ত্যাগ কর। আমি আকাশ, আমি চন্দ্র, তারা, সবই আমি। এই যে জ্ঞান ইহাই প্রকৃতি অদ্বৈত জ্ঞান। এ জ্ঞান যখন হয় তখন মানুষের মুক্তি হয়।

লণ্ঠনে আলো জ্বলিতেছে। রাশি রাশি পতঙ্গ সেইদিকে ছুটিতেছে। কেহ কেহ লণ্ঠনের গায় বসিয়াছে—কেহ বা ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। লণ্ঠনের আলোর মত প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মজ্যোতি জ্বলিতেছে। কত লোক সেই আলো দেখিয়া উন্মাদবৎ ধাবিত হইতেছে—কতলোক তাহাতে প্রাণ আহুতি দিয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞানের একটু আভাস দিবার জন্য রামকৃষ্ণ একটী সুন্দর গল্প বলিতেন :—কয়েকজন বন্ধুতে একত্র ভ্রমণ করিতে-ছিল। একটী ময়দানে গিয়া একটী সুন্দর বাগান দেখিল। তেমন সুন্দর বাগান তাহারা কখন দেখে নাই। বাগানের প্রকাণ্ড প্রাচীর। প্রাচীরের বিচিত্র শোভা। তখন উহারা ভাবিল, "যে বাগানের প্রাচীরের এত শোভা না জানি সে বাগানের ভিতরে কতই সুন্দর গাছ, কতই সুন্দর ফুল, কতই ফল আছে। এই ভাবিয়া বাগান দেখিবার 'জন্য' একজন

প্রাচীরের উপরে উঠিল; উঠিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল; উন্মত্ত হইয়া "বাহবা! বাহবা!" বলিতে বলিতে লাফাইয়া বাগানে পড়িল। সে আর ফিরিল না। তখন ২য় ব্যক্তি বড়ই কৌতূহলী হইয়া প্রাচীরে উঠিল। সেও প্রথমের ন্যায় বাগানে পড়িয়া আর ফিরিল না। তারপর তৃতীয় ব্যক্তি উঠিল, বাগানের শোভা দেখিয়া উন্মত্ত হইল, কিন্তু বাগানে পড়িল না। সে ব্যক্তি মনে মনে ভাবিল এমন সুন্দর জিনিস একলা ভোগ করিয়া সুখ হয় না; জগতের লোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনি। এই ভাবিয়া আনন্দের সহিত নামিল—জগৎবাসীকে ডাকিল:—"আয়রে আয় জগৎবাসি, তোরা দেখে যা একবার আসি, জননীর রূপরাশি কিবা চমৎকার।"

সহস্র সহস্র নর নারীকে সঙ্গে লইয়া ইনি সেই সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। ইনি মহাপুরুষ। চৈতন্য খৃষ্ট, নানক প্রভৃতি এই শ্রেণীর মহাত্মা।

ব্রহ্মজ্ঞানাদের মধ্যে যাঁহারা প্রথম দুই জনের মত তাঁহারা অধিকাংশই গুপ্তভাবে সমাজ ছাড়িয়া থাকেন—ইহারা জাতি-ভেদ মানেন না। কিন্তু যাহারা তৃতীয় ব্যক্তির মত সমাজ সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মতীর্থে অগ্রসর হন, তাঁহারা লোক শিক্ষার্থে জাতিভেদ মানেন। রামকৃষ্ণ স্বয়ং মানিতেন।

মানুষের যখন প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন সে সব বস্তুরই পূজা আরতি করে। তখন কালীঘাটের কালীর যে পাথর আর রাস্তার যে পাথর, দুই সমান জ্ঞান হয় অর্থাৎ রাস্তার পাথরকে ঐ কালীঘাটের কালীর মত বোধ হয়।

কোন সময়ে একব্যক্তি জাহাজে করিয়া যাইতে যাইতে জাহাজ ডুবি হয়। লোকটা একটা কাঠের উপর ভাসিতে ভাসিতে লঙ্কায় গিয়া উঠে। রাক্ষসেরা তাহাকে লইয়া বিভীষণের কাছে গেল। বিভিষণ তাহাকে দেখে, রামচন্দ্র এই মানুষরূপ ধ'রে অবতার হয়েছিলেন বলিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। মানুষের যখন জ্ঞান হয় ভগবান প্রত্যেক পদার্থ-রূপে অবতার হইয়াছেন তখন সেই ব্রহ্মজ্ঞানী সমস্ত পদার্থের পূজা ও আরতি করেন। যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী সে সাকার পূজার বিরোধী নহে।

হরকালী দর্শন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য একদিন রাত্রিশেষে, নীলাচলে বসিয়া পশ্চিমাকাশের দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন। তখন রজনী শেষ সীমায় উপস্থিত—প্রকৃতি অতি স্থির অতি গম্ভীর। নিকটে নীল সমুদ্র নক্ষত্র সহিত আকাশকে উদরস্থ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। আকাশে মেঘ নাই;—নীল আকাশে হীরক খণ্ডের ন্যায় তারকারাজি চক্‌মক্ করিতেছে। পশ্চিমা-কাশে চন্দ্রমা প্রকাশিত হইতেছে,—সেই চন্দ্রালোকে পৃথিবীর কিয়দংশ আলোকময় হইয়াছে, অপরাংশ ছায়াময় দেখাইতেছে। সেই আধছায়া আধ আলোকে শোভিত প্রকৃতিতে গৌরাঙ্গ এক আশ্চর্য্য চিত্রের প্রকাশ দেখিয়া মহাভাবে উন্মত্ত হইলেন। গৌরাঙ্গ দেখিলেন, আলোকময় দেশে চন্দ্রালোকে একস্থানে

ঘন হইয়াছে, সেই ঘনীভূত চন্দ্রলোকে পূর্ণানন্দময়ী রাধিকা মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছেন;—আর ছায়াময় দেশে একস্থানে ছায়া ঘন হইয়াছে এবং সেই ঘন ছায়ায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ছায়ায় শ্রীকৃষ্ণ ও আলোকে শ্রীরাধিকামূর্ত্তি দর্শনে শ্রীচৈতন্যের মহাভাবের উদয় হয়।

রামকৃষ্ণপরমহংস একদিন উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন চাঁদ আকাশের মধ্যস্থল হইতে পশ্চিমের কোণে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং প্রকৃতির এক অংশে ছায়া এবং অপরাংশে আলো পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্যের আধ আধ ভাবকে সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়াছে। রামকৃষ্ণ এক অপূর্ব্ব ভাব দেখিলেন। যেখানে ছায়া সেখানে মহাকালীমূর্ত্তি। স্থির গম্ভীর দিগম্বর মূর্ত্তি মহাদেব চন্দ্রালোকে প্রকাশিত এবং তাঁহার উপরে প্রকৃতির আঁধারময় অংশে ভীমা কালী মূর্ত্তি। দেখিবামাত্র রামকৃষ্ণ "জয় শিবকালী" "জয় শিবকালী" বলিয়া চীৎকার করিলেন আনন্দে উন্মত্ত হইলেন, মনে হইল সেই মূর্ত্তির পদতলে লুটাইয়া পড়েন। ভক্ত আকাশের দিকে স্থির নয়নে সেই মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। কখনও বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন আবার জাগ্রত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। প্রভাতে রামকৃষ্ণের সেই প্রেমভাব দর্শনে অনেকে কাঁদিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণের এই ভাবের ঘোর কয়েক মাস পর্য্যন্ত থাকিল। যখনই সেই আধ-আলো-আধ-ছায়া সুশোভিত প্রকৃতিতে সেই হরকালী মূর্ত্তির কথা মনে পড়ে, অথবা কালী মন্দিরে প্রবেশ করেন অমনি, "বাবা! বাবা! মা! মা!"

বলিয়া উন্মত্ত হন কখনও মৃতবৎ হইয়া পড়েন। চোখের এত জল যে দেখিলে ভয় হয়।

এই সময়ে অনেকে রামকৃষ্ণকে উন্মাদ মনে করিলেন। রোগ আরাম করিবার জন্য রাণীরাসমণি গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ঔষধে কি করিবে? এরোগ হইলে মানুষের ভবরোগের শান্তি হয়। এরোগ প্রার্থনীয়। রাণী রাসমণি অথবা মথুর বাবু বুঝিতে পারেন নাই, যে প্রেমের তরঙ্গ এক সময়ে ভাগিরথী তটে শ্রীনবদ্বীপে উত্থিত হইয়া অর্দ্ধ ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছিল সেই তরঙ্গই অবিশ্বাসী পৃথিবীকে প্লাবিত করিবার জন্য এত বৎসর পরে দক্ষিণসহরে রামকৃষ্ণের হৃদয় ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

সঙ্কীর্ত্তনে রামকৃষ্ণ।

মহাপ্রেমিক গোষ্ঠ যখন খোল লইয়া তাহাতে চাটি মারিত তখন রামকৃষ্ণের হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র আন্দোলিত হইত। রামকৃষ্ণের রোমাঞ্চ হইত, দুচক্ষু ভাব ভরে মুদিয়া আসিত, চক্ষের জল বক্ষ বাহিয়া মাটিকে ভিজাইত। যেই খোলের সঙ্গে করতালের শব্দ উঠিত অমনি রামকৃষ্ণের শরীর দুলিতে থাকিত। গানও শুরু হইতে রামকৃষ্ণও দুলিতে দুলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিতেন। সে মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের প্রাণ ভগবানের জন্য কাঁদিয়া উঠিত। এক দৃষ্টে সকলে সেই

মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া এই মায়াময় সংসার, আলাময় রিপু কিয়ংক্ষণের জন্ম ভুলিয়া যাইত। সে সুখ, সে আনন্দ, সে ভগবৎপ্রেমের বিদ্যুৎ-স্পর্শ ছাড়িয়া আর সংসারে ফিরিতে কাহারও ইচ্ছা হইত না। রামকৃষ্ণের সেই ভাব যখন উপস্থিত লোক সকলের হৃদয়কে বিদ্যুতের ন্যায় স্পর্শ করিত তখন সকলের প্রাণের ভিতর হইতে, "হরিবোল" "হরিবোল" শব্দ উঠিয়া সে স্থানের আকাশকে কাঁপাইয়া তুলিত। বালকেরা পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তালে তালে যুবা ও বৃদ্ধের সহিত নৃত্য করিত। গানের এক একটী পংক্তি তখন মহাশক্তিতে পূর্ণ হইয়া অতি পাষণ্ডের হৃদয়কে কাঁপাইয়া তুলিত। যখন সকলেই ভাবে উন্মত্ত, হাত পা হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তালে তালে নাচিতেছে, তখন রামকৃষ্ণে ভাবের উপর মহাভাব প্রকাশিত হইয়া ভক্তির হুঙ্কার ছাড়িত; সে হুঙ্কার শুনিয়া পশু পক্ষী কীট পর্য্যন্ত প্রাণীর হৃদয়ে হরিপ্রেমের স্ফুরণ হইত। স্ত্রী-লোকেরা পর্য্যন্ত বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া লোকলজ্জাকে বিসর্জ্জন দিত। এইরূপ অবস্থায় রামকৃষ্ণকে দেখিলে মনে হইত, স্বয়ং ভগবান বা মহাদেব প্রেমে ঢুলু ঢুলু হইয়া নাচিতেছেন। সেই সময়ে রামকৃষ্ণ ভক্তির দুর্জ্জয়স্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে গোষ্ঠের বুকের কাপড় ও খোলের দড়ি আকর্ষণ করিয়া একবার এদিক একবার ওদিক যাইতেন এবং "হরিবোল" "হরিবোল" শব্দে ভগবানের নামের জয়ধ্বনি করিতেন। আকাশে কড় কড় শব্দে যখন বজ্র পতিত হয় তখন জড়ীয় শক্তির প্রভাব দেখিয়া আমরা ভীত ও চমকিত হই, আর এই হরিসঙ্কীর্ত্তনের সময় যখন "ভক্তের প্রেমাকাশ হইতে "হরিবোল" "হরিবোল"

"সার্দ্ধত্রিতয়বিন্দুভ্যোঃ ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলী।

শ্লোক শুনিবামাত্র সকলেই অবাক হইলেন। সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা ভয় পাইলেন। রামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা রামকৃষ্ণের ঐশী শক্তির বিষয় জানিতেন না তাঁহারা গা টেপাটেপি করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ঐশী শক্তির বিষয় জানিতেন তাঁহারা ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

রামকৃষ্ণ শ্লোক শুনিলেন। কিছুই বুঝিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, আমি মূর্খ মানুষ আমার কাছে মা জগতের শাস্ত্র আনিয়া উপস্থিত করেন কেন? এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে কোন্নগরের দল খোল বাজাইতে বাজাইতে উপস্থিত হইল। সুতরাং গোলে হরিবোলে সে কথাটা সুন্দররূপে চাপা পড়িল। খোলের আওয়াজ শুনিবামাত্র রামকৃষ্ণের চেহারা ফিরিয়াছে—কথায় মিষ্টতা বাড়িয়াছে—রামকৃষ্ণ উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণের মহাভাব উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই মহাভাব পূর্ণ মূর্ত্তিতে বসিয়া রামকৃষ্ণ অধর বাবু ও মহিম বাবুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন। সে চাহনি দেখিয়া অধর বাবু কাঁপিয়াগেলেন—ভক্তিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। অধর বাবুর প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন বলিল "এ মানুষের চোখ না কালীর চোখ।" অধর বাবু তাই কাঁদিতে কাঁদিতে থর থর করে কাঁপিতেছেন। এমন সময়ে ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। মহিম বাবু তর তর করিয়া লিখিতে লাগিলেন। দেড় ঘণ্টা ধরিয়া ব্যাখ্যা হইল। সেই ব্যাখ্যা যাঁহারা শুনিলেন তাঁহাদের সর্ব্বশাস্ত্রের জ্ঞান ফুটিয়াগেল।

বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম আধখানি শ্লোকের ভিতরে দেখিয়া অবাক হইলেন। পৃথিবীর দর্শন বিজ্ঞান সেই শ্লোকার্দ্ধের ব্যাখ্যায় ঘনীভূত দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্দ্ধে যে সাড়ে তিন বিন্দুর কথা আছে তাহাই অতি কঠিন। বড় বড় পণ্ডিতেরা ঐ বিন্দুর অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকারের গোলমেলে অর্থ করিয়াছেন। সেই সাড়েতিন বিন্দুর অর্থ এই:—এখন বিন্দু কাহাকে কহে? জ্যামিতি যাহা বলিয়াছেন তাহাই অভ্রান্ত অর্থ। জ্যামিতি বলিতেছেন "যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু পরিমাণ নাই—তাহাই বিন্দু।" এ বিন্দুর কি বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে? এ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কত আলোচনা করিয়াছেন। কেহ বলেন ওটা মিথ্যাকথা—ইউক্লিডের একটা অলৌকিক অনুমান। কারণ অবস্থিতি আছে অথচ পরিমাণ নাই এমন জিনিস কোথায়?—ইহা মানুষ কল্পনায় ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের ধারণা দ্বারা সত্যের পরীক্ষা হইতে পারে না। আমাদের শক্তি যখন পরিমিত তখন ধারণাও পরিমিত। কিন্তু সত্য অনন্ত। সুতরাং বিন্দু সম্বন্ধে গণিত শাস্ত্র যাহা সংজ্ঞা করিলেন তাহা ভুল নহে। একটু গভীর ভাবে দেখিলে বিন্দু প্রকৃতি মূলে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিন্দু হইতে যেমন জ্যামিতি শাস্ত্রের উৎপত্তি—এই বিন্দু হইতে তেমনি জগৎরূপ শাস্ত্রের উৎপত্তি। প্রকৃতিতে তিনটী পূর্ণ বিন্দু আছে যথা;—সময় (Time) দেশ (Space), চৈতন্য (Spirit)। যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু পরিমাণ নাই তাহাই বিন্দু অথবা যে জিনিস আছে কিন্তু বাধা দেয় না—অবরোধ করে না তাহাই বিন্দু। সময় একটা

বস্তু ইহা আছে কিন্তু কাহাকেও বাধা দেয় না—এই সময়কে আশ্রয় করিয়া কত কাণ্ড, ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। আবার দেশ (Space) একটী বস্তু ইহাও কাহাকে বাধাদেয় না,—সমস্ত জগৎ এই দেশ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। আর চৈতন্য (Spirit) ইহাও একটি বস্তু, কাহাকেও বাধাদেয় না। এই চৈতন্য দেশ, কাল সঙ্গে লইয়া সবই করিতেছে। সময় দেশ ও চৈতন্য এই তিন বস্তুর মধ্যে কেহ কাহাকে বাধাদেয় না। এইজন্য এই তিনটী মহাবিন্দু। আর চৈতন্যই ঘন হইয়া জড় হইয়াছে বলিয়া জড়কে আধখানা বিন্দু বলা হইয়াছে—চৈতন্য বিন্দুই ঘন হইয়া বাধা দিতেছে, এইজন্য জড়কে অথবা চৈতন্যের জড়াবস্থাকে অর্দ্ধবিন্দু বলা হইয়াছে। এই অর্দ্ধবিন্দু কেবল মাত্র স্বজাতীয় বস্তুকে বাধা দেয়।

ঐহিকতার মস্তকে পদাঘাত।



লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি নামক এক ধনী রামকৃষ্ণ পরমহংসের নামে দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিতে চাহেন। রামকৃষ্ণ অস্বীকার করেন। তাহাতে লক্ষ্মীনারায়ণ রামকৃষ্ণকে অনেক জেদাজেদি করিতে থাকেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন, আপনার নামে দিতে যদি আপত্তি হয় তো আপনার কোন শিষ্যের নামে লিখিয়া দি। রামকৃষ্ণ তাহাকে উত্তর করেন, "তাহাতেও আমার টাকা বলিয়া, মনে অহংকারের

দাগ বসিবে,—সুতরাং তুমি ও সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।" লক্ষ্মী নারায়ণ তখন রামকৃষ্ণের দু পা জড়াইয়া "আপনাকে টাকা লইতেই হইবে, না লইলে আমার মনে ক্লেশ হইবে" বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন রামকৃষ্ণ আপনার কালী-মার নিকট কাঁদিয়া নিবেদন করিলেন, "মা! আমার কাছে এসব লোককে কেন আন! ইহারা আমাকে তোমা হইতে দূরে ফেলিতে চায়।" রামকৃষ্ণের কান্না শুনিয়া ধনী মহাশয়ের জ্ঞান হইল। তিনি আপনার কামনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

মথুরবাবু একদিন পনেরশত টাকা দামের একখানি ভাল শাল কিনিয়া রামকৃষ্ণকে দান করেন। রামকৃষ্ণ সেই শাল খানিকে মাটিতে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, "মন। একে বলে শাল। বড়মানুষেরা এ গায়ে দেয়। এ গায়ে দিয়ে গরিব লোকের কাছে গেলে তাহাদের উপর ঘৃণা হয়। ইহা ভেড়ার লোমে। ইহা পুড়িলে এমনি দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, কেহ টিকিতে পারে না। ইহার পরিণাম মাটী।" বলিয়াই থু থু করিয়া উহার উপর থুথু ফেলিতে লাগিলেন। মথুরবাবু একটু দূর হইতে ইহা দেখিতে দেখিতে রামকৃষ্ণের উচ্চভাব বুঝিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণের তীর্থভ্রমণ।



মথুরবাবু, মথুরবাবুর স্ত্রী ও রামকৃষ্ণ তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। প্রথমে কাশী গেলেন। অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাইবার সময় রামকৃষ্ণ আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিতেন না। মৃতবৎ হইয়া যাইতেন। রামকৃষ্ণকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইত। প্রকৃত যা দেব দেবী দর্শন তাহাই তাঁহার হইত।

কাশী গিয়া রামকৃষ্ণ তৃপ্তিলাভ করেন নাই। কাশীতে প্রকৃত সাধু অতি অল্প। ন্যাড়ামাথা সন্যাসী অনেক—কিন্তু প্রকৃত সন্যাসী এক ত্রৈলাঙ্গ স্বামী বই আর কাহাকেও দেখেন নাই। ত্রৈলঙ্গস্বামীর সহিত আলাপ করিয়া রামকৃষ্ণ কাশী দর্শনের প্রকৃত ফল লাভ করিয়াছিলেন। কাশী হইতে বৃন্দাবন গেলেন। সেখানে আরো দুরাবস্থা। নিষ্কাম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ভয়ানক ব্যাভিচারের স্রোতে বৃন্দাবন ভাসিতেছে। তবে অতবড় তীর্থ একবারে সাধুশূন্য হইতে পারে না। নিধুবনে গঙ্গামাতাকে দেখিয়া রামকৃষ্ণ অতিশয় তৃপ্তি পাইলেন। গঙ্গামাতা স্বহস্তে পাক করিয়া স্বহস্তে রামকৃষ্ণকে খাওয়াইয়া দিতেন। রামকৃষ্ণে মহাভাবের প্রকাশ দেখিয়া গঙ্গামাতা আপনার বৃন্দাবন বাস সফল হইল ভাবিয়া রামকৃষ্ণকে ছাড়িতে চাহেন নাই। মহাভাবের কথা শাস্ত্রে পড়িয়াছেন—শ্রীচৈতন্যের

হইত এইমাত্র জানিতেন, আজ রামকৃষ্ণ সেইসব লক্ষণ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—আপনার জীবনকে ধন্য ভাবিলেন। রামকৃষ্ণের যখন মহাভাব হইত তখন গঙ্গামাতা, "দুলালী"! "দুলালী"! বলিয়া চীৎকার করিতেন, ভক্তিতে রোদন করিতেন এবং সেই সময়ে চারিদিকে শ্রীমতী রাধিকার প্রকাশ দেখিয়া প্রেম-পাগলিনী হইতেন।

রামকৃষ্ণ যেদিন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন, সেদিন গঙ্গামাতা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া পরমহংসের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন:—"ওরে দুলালী! বৃন্দাবন যে তোর থাকিবার স্থান। ব্রজবালাদেরও, বৃন্দাবন ব্যতীত আর দ্বিতীয় স্থান নাই। আমি বৃন্দাবনে বাস করিয়া আছি, কেন আছি তুইকি জানিস না। যদি দাসী ব'লে মনে হ'য়েছে, যদি দয়া করে দেখা দিলি, তবে আর কেন আমায় বিরহানলে দগ্ধ করবি, হাঁরে, আশায় কতদিন প্রাণ বাঁচে? বরং আশা থাকিলে তাহাতে প্রাণ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। কিন্তু মিলনের পরে বিরহ যে কি অসহ্য দুঃখ, দুলালী তাকি তুই জানিসনে? আমি এতদিন কেবল ভাবে প্রাণধারণ করেছি। মনে করিতাম এই বৃন্দাবনে একদিন আমার কমলিনী কদম্বমূলে—কোন্ কদম্বটী তা জানিনা—কানাই এর সহিত বিহার করিয়া গিয়াছেন, কদম্ববৃক্ষ চারিদিকে দেখিতে পাই; কিন্তু কোথাও আমার নন্দকিশোর—রাইকিশোরীকে দেখিতে পাই নাই। আমাদের সেই যুগলরূপ কই? যখন দেখি বিপিন প্রান্তে, প্রান্তরে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম হইয়া রহিয়াছে, তখন মনে হয়, কোথায় সে গোপাল! সে গোপাল কোথায়! কোথায় সে গোপাল

কোথায় সে গোপালবংস্যগণ! আর যখন ঐ মাঠে গোপাল বিচরণ করিয়া বেড়ায় তাহাদের দেখিয়া আমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইয়া নয়নে জলধারা বহিয়া যায়। মনে হয়, সখি, আমাদের গোপাল এক সময়ে ঐ রূপে গোপাল লইয়া বেড়াইত। তখন মা যশোদার সাজান বেশ মনে উদয় হইয়া আমায় আপন হারা করিত। গোপালের মাথায় চূড়া, বৃন্দাবন তিলকের নাসায় তিলক, ললাটে ও কপোলদেশে অলকাবিন্দু সকল যেমন শরদ কালের নিশায় তারকারাজি সদৃশ দেখাইত। তাহার ওষ্ঠাধরে গজমতি। আহা! কি সুমধুর মৃদুহাস্য, হাস্যছটায় মনপ্রাণ বিমোহিত হইয়া যাইত। মরি মরি! কিবা ভ্রুভঙ্গি, সে আড়নয়নের চাউনি মনে হ'লে কোন কুলবালা, কুলশীলে জলাঞ্জলী না দিয়া স্থির থাকিতে পারে? যে ভাল তার কি সকলই ভাল। ভাল কিসে? অমন নিষ্ঠুর কি আর আছে! কুলের কুলবধূর কুল ভাঙ্গিয়া, তাদের পথের ভিখারিনী করিয়া শেষে দুকুল নষ্ট করিবার অমন গুরুমহাশয় আর কি দ্বিতীয় আছে? সখি! ঐ দেখ যমুনা, যে যমুনাকূলে ব্রজকুলবালা কুলশীল ভুলিয়া গোকুলচন্দ্রের বদনচন্দ্র বিনিঃসৃত সুমধুর বংশীধ্বনি স্বরূপ অমৃতধারা শ্রবণ পথে চলিবার জন্য একত্রিত হইত, যে যমুনাতীরে একদিন নন্দদুলাল গোপাঙ্গনাদিগের বস্ত্র হরণ করিয়া বৃক্ষশাখায় লুকায়িত ছিল, সে বৃক্ষ আছে সে যমুনাতট আছে, কিন্তু সে চোর কই? তাকে কেন দেখিতে পাই নাই। সে যমুনাপুলিনে আমাদের কমলিনী কনকলতিকা, শ্যাম, কদম্ব ভ্রষ্ট হইয়া যে দিন ধুলা ধূসরিত হইয়া সখীদিগের রোদনস্বরের সহিত হা কৃষ্ণ!

"হা কৃষ্ণ!" স্বর সমস্বরে ধ্বনিত করিয়াছিল, সে সখি রাই বা কোথায়? আর সেই ব্রজেশ্বরীই বা কোথায়? সে কুঞ্জবন আর নাই, এখন সকলই নিবিড় বন। বৃন্দাবনে বাস করি, কিন্তু মনের সাধে কথা কহিবার কেহ নাই। তাই বলি অরে ছলালি! তুই কোথায় আমায় ফেলিয়া পলায়ন করবি।* পরমহংসদেব গঙ্গা মাতাকে অনেক বুঝাইয়া অবশেষে বিদায় গ্রহণ করেন।

আপন আশ্রমের বাহিরে।

সিদ্ধাবস্থার পর রামকৃষ্ণ একবার আপন গ্রামে গমন করেন। গ্রামে খুড়া জেঠা দাদা পিসি খুড়ি জেঠাই সকলে রামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিল। গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিশেষতঃ বৃদ্ধারা রামকৃষ্ণের হাব ভাব দেখিয়া একবারে সংসার ভ্রষ্টা হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণ কামারপুকুরের নিকট শ্যামবাজার নামক পল্লীতে কোন আত্মীয়ের বাটীতে গেলেন। সেখানে হরি-সংকীর্ত্তনের রোল উঠিল। ভক্তির স্রোত বহিল। লোকে লোকারণ্য হইল। রামকৃষ্ণ কখনও কখন মৃতবৎ হইয়া যান—নাড়ী পাওয়া যায় না—শরীর হিম অসাড় আবার ক্ষণিক

---

* শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত পরমহংসের জীবন বৃত্তান্ত পৃঃ ৫৭—৫৮।)

পরেই সংজ্ঞা হয়, দেখিয়া বুড়া যুবা ছেলে মেয়ে সকলে অবাক হইল ; "হরিবোল" "হরিবোল" শব্দে গ্রামের পাপ তাপ উড়িয়া যাইতে লাগিল। পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হইল এক অদ্ভুত ভক্ত আসিয়াছেন—হরিনাম বলিতে বলিতে শুনিতে শুনিতে মরিতেছেন আবার বাঁচিতেছেন। কথা শুনিয়া লোকের ভিড় এত হইল যে গ্রামে আর লোক ধরে না—মাঠ পর্যন্ত লোকের ভিড়—মাঠের উপর দিয়া পিপীলিকার সারির মত লোক আসিতেছে এবং "হরিবোল" "হরিবোল" শব্দে গ্রামকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। রামকৃষ্ণ এত লোকের ভিড় দেখিয়া ভয় পাইলেন—একদিন হঠাৎ সরিয়া পড়িলেন।

রামকৃষ্ণ মথুর বাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে আদি ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। একদিন গিয়া বসিয়া আছেন—ব্রাহ্মদের গান শুনিয়া ভাবে বিভোর হইয়াছেন। ব্রাহ্মরা যখন উপাসনা করিতে করিতে ধ্যান অবলম্বন করিলেন তখন রামকৃষ্ণ একটী যুবার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—রামকৃষ্ণের সেই যুবাকে দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। কারণ অন্যান্য সকল ব্রাহ্মের কপট ধ্যান আর সেই যুবার প্রকৃত ধ্যান। রামকৃষ্ণ মথুর বাবুকে চুপে চুপে বলিলেন "ঐ যে যুবা দেখিতেছ উহার ফাতনা নড়িতেছে ; * আর যে সব দেখিতেছ ওসব কিছুই নয়।"

---

* ধ্যান সরোবরের মনবড়শিতে ব্রহ্ম মৎস্য ঠোকর মারিতেছে—অর্থাৎ এই যুবা ব্রহ্ম জ্যোতির আভাস পাইতেছে।

কলুটোলায় চৈতন্যসভায় গমন করেন। সেখানে সংকীর্ত্তনের সময় মহাভাবের সঞ্চার হইলে রামকৃষ্ণ ভগবানের শক্তিতে পূর্ণ হইয়া চৈতন্যের আসনে গিয়া বসিলেন। কেহ কেহ তাঁর মহাভাব বুঝিতে সমর্থ হইয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং কেহ কেহ বুঝিতে না পারিয়া কপট ভণ্ড বলিয়া রটনা করিতে লাগিলেন। কালনার ভগবানদাস বাবাজি এ কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে রামকৃষ্ণে যখন স্বচক্ষে মহাভাবের প্রকাশ দেখিলেন তখন রামকৃষ্ণের দুপা জড়াইয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ মথুর বাবুর সঙ্গে শ্রীমৎভগবানদাস বাবাজিকে দেখিতে যান। তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র বাবাজি বলিয়া উঠিলেন "কোন মহাপুরুষ দীনের প্রতি দয়া করিয়া কুটীরে চরণধূলি দিলেন।" তারপর রামকৃষ্ণের দুপা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন," আজ আমি কৃতার্থ হইলাম। প্রভু! শক্তিহীন কাঙ্গাল জানিয়া দয়া করিয়া নিজগুণে দর্শন দিয়া চির আশা পূর্ণ করিলেন। আমি অতি অপবিত্র, নরাধম, মহাপাপী। কেন না আমি আপনি তীর্থ পর্য্যটন কিম্বা সাধু দর্শন করিতে অশক্ত হইয়া একস্থানে পিণ্ডাকারে পতিত রহিয়াছি। কিন্তু দয়ার সাগর ভগবান, ভগবান দাসের প্রতি বুঝিলাম এতদিন পরে সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। আজ সাধু পদধূলিতে আমি পবিত্র, আশ্রম পবিত্র, দেশ পবিত্র হইল। এমন সুদুর্লভ পদার্থ সর্ব্বত্র দুষ্প্রাপ্য। যাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডম্ বিরাজ করিতেছেন, যাঁহারা হৃদিবৃন্দাবনে নিত্য রাসলীলা দর্শন করিয়া রসিক শেখরের চরম প্রেম আস্বাদন করিতেছেন, যাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া সৃষ্টি কর্ত্তাকে আপন হৃদয়

পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন তাঁহারাই সকলের পূজ্য এবং সকলের প্রণম্য।"

একদা বাবু কৃষ্ণদাস পাল ও কলিকাতার কয়েকজন রাজা মহারাজা একটী সভায় পরমহংসকে নিমন্ত্রণ করেন। পরমহংস ধনী লোকদের ভাল না বাসিলেও নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন নাই। রামকৃষ্ণ রাজসভায় গিয়া বসিলেন সকলেই খুব ভক্তির সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। কৃষ্ণদাস বাবু সকলের মুখপাত্র স্বরূপ বলিলেন," বৈরাগ্য শাস্ত্র এ দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সকল বস্তু অসার বলিয়া শিক্ষা দেওয়া সেকেলে কথা। এইরূপ শিক্ষার দোষে ভারতবর্ষ আজ পরাধীন। যাহাতে আপনার এবং দেশের হিতসাধন হয় এরূপ উপদেশ দিবেন। পরমহংস মৃদুহাস্যে অতি সুন্দর উত্তর দিলেন "তোমার মত রাড়িপুত বুদ্ধির লোক আর দেখা যায় না' তুমি কি বলিতেছ? জীবের হিতসাধন করিবে? কি হিত করিবে আমায় বুঝাইয়া দিতে পার? তোমরা যাহাকে হিত বল আমি জানি। পাঁচজনকে অন্ন দেওয়া, ব্যাধি হইলে চিকিৎসা করা, একটা রাস্তা করা কিম্বা একটা পুষ্করিণী বুজান রহিত করা,—এইতো তোমাদের হিতসাধন? হিত—কিয়ৎ পরিমাণে বটে। কিন্তু বল দেখি মানুষের শক্তিতে এই হিত কতদূর সাধন হইতে পারে? অন্ন কষ্ট নিবারণ করিবে? এ কষ্ট হইল কেন? কারণ ঈশ্বর প্রচুর ধান্যাদি দেন নাই। তোমরা নানাস্থান হইতে চাউল লইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা পাইলে, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইল? কত লোককে বাঁচাইলে? সত্য বল, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষে কত লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়াছে?

তোমাদের চেষ্টার তো ত্রুটি হয় নাই, অর্থের অনাটন ছিল না, তবে লোক রক্ষা হইল না কেন? ম্যালেরিয়া জ্বরে এক একটী দেশ জন শূন্য হইয়া গিয়াছে। ঔষধে কি করিল? যাহারা বাঁচিয়াছে ঔষধ না দিলেও তাহারা বাঁচিত। হিত করিবে বলিয়া মনে অহংকার হয় কিন্তু জগৎখানা কি? কত বিস্তীর্ণ তাহার কোন জ্ঞান আছে? জীব বলিলে শুধু মনুষ্য বুঝায় না। যত প্রাণী এই জগতে আছে সকলের আহার যোগায় কে? ইহাদের রক্ষা করে কে? ঈশ্বর বলিয়াছেন মানুষের আত্মাভিমান দেখিয়া তিন বার হাসিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তির আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে, চিকিৎসক যখন জোর করিয়া বলে ভয় কি? আমি বাঁচাইয়া দেব। ভাই ভেয়ে বিবাদ করিয়া যখন সূত্র ফেলিয়া জমি ভাগ করে, তখন একবার হাসেন। আর এক, রাজা যখন অপর রাজার রাজ্য কাড়িয়া লয়, তখন একবার হাসেন। বাবু! গঙ্গায় কাঁকড়ার বাচ্ছা হয় দেখেছ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি একটী কাঁকড়ার বাচ্ছা বিশেষ; জীবের হিত করিবে মনে করিলে পাপ হয়।" * কৃষ্ণদাস বাবু প্রভৃতি অবাক। আর কথা কহিবার শক্তি নাই। আজ যদি প্রিন্সবিসমার্ক উপস্থিত থাকিতেন, তাঁকেও নিরুত্তর হইতে হইত—অভিমান রসাতলে যাইত। প্রকৃত ঠাকুরের কাছে বাজী মাৎ করিতে এপর্যান্ত কেহই পারেন নাই।

---

* বাবু রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—পৃঃ ৯১—৯২।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত আপনি দেখা করিতে যান। দয়ার সাগরের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। যেমন মানুষ তীর্থ দর্শনে যায় সেইরূপ পরমহংস বিদ্যাসাগর দর্শনে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের নিকট যখন গেলেন, তখন বিদ্যাসাগর কয়েকটী শিশুর সহিত খেলা করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সেই শিশুভাব দেখিয়া পরমহংস বড়ই আনন্দিত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রামকৃষ্ণকে খুব আদর করিলেন। রামকৃষ্ণ বলিলেন "আজ আমার সাগর দর্শন হইল।" বিদ্যাসাগর হাসিয়া বলিলেন "নদী ও সরোবরে মিষ্ট জল খাইয়া এখন লোনা জল খান।" রামকৃষ্ণ বলিলেন "এতো অবিদ্যার সাগর নয়—এ যে বিদ্যার সাগর।" এই প্রকারে অনেক রহস্যের কথা হইল। তারপর গভীর বিষয়ের আলোচনা হইল। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসিলেন "এ দুনিয়ার যিনি মালিক তিনি কি বস্তু? রামকৃষ্ণ ভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন "এ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্র তাঁহাকে এঁটো করিতে পারে নাই। বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ সকলে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, এতদিন পরে নূতন মিষ্ট গভীর কথা শুনিলাম—অনেক সাধুর সহিত আলাপ করিয়াছি, এমন প্রাণভুলান কথা কোথাও শুনি নাই।" রামকৃষ্ণের প্রকৃতিতে যে আদতে খাদ নাই এ কথা বিদ্যাসার বলিয়াছিলেন।

অধরলাল সেনের বাড়িতে বঙ্কিম বাবুর সহিত আলাপ হয়। বঙ্কিম বাবুকে বাঁকা বলিয়া তামাসা করেন এবং সেই

সঙ্গে এমন উপদেশ দেন যে বঙ্কিমের জীবনে এক নূতন তরঙ্গ উপস্থিত হয়। সেই সময় হইতে ধর্ম্ম উপন্যাস লিখিবার ইচ্ছা বঙ্কিম বাবুর খুব প্রবল হয়। "দেবী চৌধুরাণী" এই আলাপেরই ফল। এই আলাপের পর হইতেই বঙ্কিম বাবু হিন্দুভাবে পরিণত হন। রামকৃষ্ণেরই শক্তি শেষে বঙ্কিমের জীবনকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করে। সাধুশক্তির কি অপূর্ব্ব মহিমা!

শক্তি প্রকাশ।

ভক্তগণ সময় বিশেষে ভগবানের হুকুম অনুসারে শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

উইলিএম নামক রামকৃষ্ণের সাহেব শিষ্য রামকৃষ্ণ কর্তৃক এক বিশেষ অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া ভক্তিভরে রামকৃষ্ণের পদতলে লুটাইয়া পড়েন। যে সময়ে কলিকাতার বড় বড় পাদ্রিরা কেশবের সঙ্গে রামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতেছিলেন—যে সময়ে পাদ্রি মহলে রামকৃষ্ণ এক গম্ভীর আলোচনার বিষয় হইয়াছিলেন—সেই সময়ে উইলিএম নামক কোন সাহেব রামকৃষ্ণের নিকট গমন করেন। উইলিএম বড়ই সরল ইংরাজ। ইনি রামকৃষ্ণকে সেলাম করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদের যীশু কত অলৌকিক ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন; আপনি কিছু অলৌকিক দেখাইতে পারেন"? তাহাতে রামকৃষ্ণ একটু হাসিয়া কহিলেন "সে কথা পরে যা হয় হবে—তুমি

একবার দূর হ'তে আমার কালী মাকে দেখে এস"। উইলিএম কালী বাড়ির বাহিরে জুতা রাখিয়া যেই কালী মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন অমনি কালীমূর্ত্তিস্থলে যীশুখ্রীষ্টের মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র, সাহেব এক আশ্চর্য্যরসপূর্ণ ভক্তিভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। তারপর কালীকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাছে আসিবামাত্র রামকৃষ্ণ আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেমন? তোর যীশুখ্রীষ্ট যে, আমার কালীও সে দেখলি তো"? ইংরেজ যুবা তখন রামকৃষ্ণের দুই পা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "প্রভু! আমায় উদ্ধার করুন! প্রভু! আমায় উদ্ধার করুন"। রামকৃষ্ণ ইহাকে কোন "নাম" সাধন করিতে দিলেন। এই ইংরেজ যুবা এখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনে পার্ব্বতীয় প্রদেশে রামকৃষ্ণের উপদেশানুসারে সাধন করিতেছেন।

এক সময়ে রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বাবু বলিতেছিলেন। "ভগবান যে নিয়ম দ্বারা জগৎ সংসার চালাইতেছেন, সে নিয়মের তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না"। এই কথা শুনিবামাত্র মহাপুরুষ বলিলেন "তোমাদের এমনি বুদ্ধি না হইলে পৃথিবীর এ দশা হবে কেন? যিনি নিয়ম বিধাতা তিনি নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না—তাহা হইলে নিয়মের শক্তি ভগবানের শক্তি অপেক্ষা অধিক। আমার ভগবান যিনি তিনি নিয়মের সৃষ্টি করিতে যেমন পারেন আবার ধ্বংস করিতেও তেমনি পারেন"। মথুর বাবু অমনি বলিলেন এই যে লাল জবার ফুলগাছ এতে কি তিনি সাদা জবা ফুটাইতে পারেন? রামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমার মা

যদি সত্য হয় তুই কাল সকালে লাল জবার গাছে সাদা জবা দেখিতে পাইবি"। অমনি মথুর বাবু ছুটী কুঁড়িযুক্ত একটী বৃন্ত স্পর্শ করিয়া কহিলেন "এই বোঁটায় ছুটী তো লাল কুঁড়ি আছে—কাল সকালে একটী লাল ও একটী সাদা হবে"? রামকৃষ্ণ জোরের সহিত কহিলেন "যদি কাল সকালে একটী লাল ও একটী সাদা জবা না ফোটে তো মা মিথ্যা"। এই সময়ে রামকৃষ্ণের মূর্ত্তিতে এক আশ্চর্য্য শক্তি ফুটিয়াছিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে মথুর বাবু জবা গাছের কাছে আসিয়া দেখেন, তাঁর সেই চিহ্নিত বৃন্তে একটী লাল জবা আর একটী সাদা জবা ফুটিয়াছে। মথুর বাবু ফুল ছুটী নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতেছেন এমন সময়ে রামকৃষ্ণ সেখানে আসিলেন। তখন মথুর বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা! এ ভগবানের নয় আপনারই মহিমা"। "আমার মা সত্য কি না দেখলি"; বলিয়াই রামকৃষ্ণ মহাভাবে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন।

উড়িষ্যার কোন ভদ্রলোক স্ত্রী বিয়োগের পর অতি বৈরাগ্যে আক্রান্ত হইয়া কেশব বাবুর দলভুক্ত হয়েন। আপনার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি-বিক্রয়-লব্ধ-টাকা লইয়া কেশব বাবুকে ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্যার্থ দান করেন। ব্রাহ্মগণ এরূপ স্বার্থ ত্যাগী বন্ধু পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। এই ভদ্রলোক একদিন কেশব বাবুর সঙ্গে রামকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। কেশব বাবু ও অন্যান্য ব্রাহ্মেরা সেই বৈরাগী মহাশয়ের অনেক প্রশংসা করিলে; পরমহংসদেব কেশব বাবুকে বলিলেন "এ ব্যক্তি এখনও আমড়ার আঁবল খাবে"। কি আশ্চার্য্য? কয়েকমাস পরে ভদ্রলোকের বৈরাগ্যের নেশা কাটিলে,

উকিলের চিঠি আনিয়া কেশব বাবুর নিকট হইতে আপনার সমস্ত টাকা আদায় করিয়া, স্থবর্ণ রেখায় কাল জল পার হইয়া, খুব আমড়ার আম্বল খাইতে লাগিলেন।

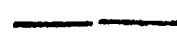
যে সময়ে পাকাবেল পাওয়া যায় না, সেই সময়ে পরমহংস মহাশয় কোন্নগরের কোন ভদ্রলোককে বলিলেন, "ওহে গোটা চার পাকা বেল এনে দিতে পার"? ভদ্র লোক বলিলেন, "মহাশয়! এখন বেল পাকিতে তিন মাস দেরি। পাকা বেল তো পাওয়া যাবে না"। রামকৃষ্ণ বলিলেন, "আচ্ছা সকালবেলা একবার তলায় গিয়ে দেখ দেখি যদি দু একটা পাও"। ভদ্রলোক বাড়ি গিয়া আপনার বেলগাছটী বিশেষরূপে দেখিলেন—সবই কাঁচা বেল। কিন্তু মহাভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারায় ভদ্রলোক বড়ই চিন্তিত ও ব্যথিত হইলেন। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। ভোর বেলা বিছানা হইতে ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ শব্দ শুনিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিলেন। বেল তলায় গিয়া চারটী পাকা বেল দেখিয়া ভক্তিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। রামকৃষ্ণকে সেই চারটী বেল দিয়া আসিলেন।

একদিন রামকৃষ্ণের নিকট হইতে কোন ভদ্রলোক উঠিয়া যাইলে মহাপুরুষ কোন শিষ্যকে চুপে চুপে বলিলেন, "এই যে লোকটী; এত পোষাক, এত আড়ম্বর এত ভদ্রতা—এ লোকটীর জন্মের ঠিক নাই"। শিষ্য রামকৃষ্ণের বাক্য পরীক্ষার জন্য ভদ্রলোকটীকে রাস্তায় ধরিলেন—ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার গ্রামে গেলেন। গ্রামে গিয়া অন্বেষণে জানিলেন, রামকৃষ্ণের কথা সত্য।

বাগবাজারের বলরাম বসুর বাটীতে মহাপুরুষ প্রায়ই যাইতেন। বলরাম বাবু রামকৃষ্ণের জন্য আনিত খাদ্যের সহিত অন্য খাদ্যও মিশাইয়া দিতেন, রামকৃষ্ণ আপনার জন্য আনিত খাদ্য গুলি বাছিয়া খাইতেন। এ প্রকার ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

মহাপুরুষ এক সময়ে কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে নিমন্ত্রিত হয়েন। বাটীর গৃহিণী অতি ধর্ম্মপরায়ণা। রামকৃষ্ণ তাঁর হাতে মাঝে মাঝে খাইতেন। একদিন সেই নিমন্ত্রণে গিয়া বসিয়া আছেন—হঠাৎ বলিলেন, "আজ খাওয়া হবে না সব জিনিস অপবিত্র হইয়াছে"। বাটীর গৃহিণী রাঁধিতে রাঁধিতে অপবিত্রা হইয়াছিলেন—বুঝিতে পারেন নাই। গৃহিণী রামকৃষ্ণ খাইবেননা শুনিবামাত্র সতর্ক হইলেন এবং বুঝিলেন, তিনি অপবিত্রা হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ গোপনে কোন কোন বন্ধুকে এই কথা বলিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ বলিতেন, যেমন ঘরের শার্শির ভিতর দিয়া ঘরের ভিতরের সমুদয় দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়; সেইরূপ মানুষের চোকের ভিতর দিয়া মানুষের ভিতরের সবই দেখিতে পাই। তিনি আরো বলিতেন "মানুষ আমার কাছে কাঁচের আলমারির মতন।"



রামকৃষ্ণের বালক ভাব।



সিদ্ধপুরুষদের বাল্যভাব চির প্রসিদ্ধ। রামকৃষ্ণ চিরকালই বালক ভাবে কাটাইয়াছেন। "যৌবনে বিষম কাল" এটী রামকৃষ্ণের জীবনে আদতে খাটে নাই। যৌবনের বিকার ইনি জীবনে কখনও অনুভব করেন নাই। ইনি সংসারের জননীর কোল হইতে জগজ্জননীর কোলে গিয়া যেন আরও বালক হইয়া পড়িয়াছিলেন। বালকের ন্যায় বসিতেন, বালকের ন্যায় কথা কহিতেন, বালকের ন্যায় রোদন করিতেন। বালকেরা কাপড় পরিয়া দু দণ্ড থাকিতে পারে না, ইনিও কাপড় পরিয়া থাকিতে পারিতেন না। "লোক লজ্জা" রামকৃষ্ণের আদতে ছিল না।

এক সময়ে পড়িয়া গিয়া ইঁহার হাত ভাঙ্গিয়া যায়। হাতে বড় বেদনা হয়। এ অবস্থায় কেহ দেখিতে আসিলে বালকের ন্যায় হাত খানি অগ্রসর করিয়া বলিতেন, "উঃ বড় লাগছে একটু ফুঁ দাও না"। আবার যদি কেহ বলিতেন, "ভয় নাই ভাল হইবে"। তখন আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিতেন, "ও হরি! ইনি বলছেন, আমার হাত ভাল হবে"।

একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর গঙ্গায় বান ডাকিবার শব্দ শুনিয়া রামকৃষ্ণ তড়াক করিয়া উঠিয়াই উলঙ্গ ভাবে দৌড় দিলেন। দৌড়িতে দৌড়িতে ডাকিতে লাগিলেন, "ওরে

বান ডেকেছে কে দেখবি শীঘ্র—ওঠ, শীঘ্র—ওঠ"। অন্যান্য লোকদের কাপড় পরিতে একটু বিলম্ব হইল—ইহারা গঙ্গার ধারে গিয়া দেখে রামকৃষ্ণ নাচিতেছে বান চলিয়া গিয়াছে। মহাপুরুষ ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "দেরি হ'ল কেন"? "এই কাপড় পরেই আসছি—দেরি আর কোথা"?—এই কথা বলিলে মহাপুরুষ বালকের ন্যায় কহিলেন, "দুঃশালারা! কাপড় পরতে গেলে কি বান দাঁড়িয়ে থাকে"।

মহাপুরুষ দক্ষিণেশ্বরের নিকটে কোন স্থানে রামায়ণ পাঠ শুনিতে যাইতেন। তথায় শুনেন যে রামনাম উচ্চারণ করিলে মানুষ নির্ম্মল হয়। একদিন শুনিলেন, কথক মহাশয় বাহ্যে গিয়াছেন। কথক মহাশয় শৌচ হইতে ফিরিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় রামনামে আপনি এখনও নির্ম্মল হন নাই কেন"? রামকৃষ্ণ এরূপ সরল শিশুর ন্যায় সুরে এই কথা গুলি বলিয়াছিলেন যে কথক মহাশয় কাঁদ কাঁদ হইয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "বাবা! রামনাম করিলে মনের ময়লা যায়"।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি ধারি ব্রাহ্মযুবা একদিন রামকৃষ্ণের নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি খুব সাধু সে জন্য আপনাকে ভক্তি করি; কিন্তু আপনি কয়েকটা মহা অপরাধ করিয়াছেন"। অপরাধের কথা শুনিবা মাত্র রামকৃষ্ণ বালকের মত বলিলেন, "কি ভাই কি অপরাধ করেছি"? যুবা বলিলেন, "আপনি আপনার স্ত্রীর প্রতি কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম করেন না। আর অনেক যুবাকে সংসার ভ্রষ্ট করে তাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মে বাধা দিতেছেন।" রামকৃষ্ণ বলিলেন, "তা—তা—

মা আমায় বলেছেন তাইতো করেছি; তা মাকে জিজ্ঞাস ক'রে তোকে উত্তর দেব"। রামকৃষ্ণের তখন বাহ্যে পাইয়াছিল যুবাকে একটু বসিতে বলিয়া বাহ্যে গেলেন। বাগানে বাহে বসিয়া দুটী ছোট ইট লইয়া খেলা করিতে করিতে বলিতেছেন "হ্যা মা!——শালা বলে আমি অন্যায় কাজ করেছি। হ্যা মা! আমি কি অন্যায় করেছি গা"? তখন রামকৃষ্ণ মার মুখে অভয় বাণী শুনিলেন, "বাবা! তুই ঠিক কাজ করেছিস" সেই কথা বিদ্যুতের ন্যায় রামকৃষ্ণের প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয় রামকৃষ্ণের মূর্ত্তিকে যেন নূতন করিয়া গঠিত করিল—রামকৃষ্ণে দু চক্ষু দিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি জ্বলিতে লাগিল। ভক্ত চৈতন্য পূর্ণ মূর্ত্তিতে (শৌচাদির পর) যুবার কাছে গিয়া বলিলেন "তা তুই বলিস অন্যায় করেছি—মা তো বল্লেন আমি ঠিক কাজ করেছি;—আঁ মা বলেছেন আমি ঠিক কাজ করেছি তুই যা তোর কথা আমি মানিনা"। রামকৃষ্ণের সেই স্বর্গীয় মূর্ত্তি এবং সেই দেবস্থর পূর্ণ কথা শুনিয়া যুবার মনে হইল, এমন মিষ্ট তেজস্বী প্রাণ মাতান কথা তো কখনও শুনি নাই— এ যেন ভগবানের কথা বলিয়া বোধ হইতেছে। যুবা সেই কথার আকর্ষণে আপনার বিদ্যা বুদ্ধি, মান সম্ভ্রম, সমস্ত আহুতি দিয়া বসিল। যুবা দেখিল কথার সুর তেজ জীবনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে—প্রাণে বৈরাগ্যের আগুণ জ্বলিয়াছে— যুবার সমস্ত প্রকৃতি ভগবানের জন্য উন্মত্ত হইল। যুবা রামকৃষ্ণকে হারাইতে গিয়া আপনাকে রামকৃষ্ণে হারাইয়া ফেলিল। এই যুবা একজন রামকৃষ্ণের পরমভক্ত শিষ্য।

রামকৃষ্ণের বিবাহের সময় বাজনা না হওয়ায় অনেক দুঃখ

করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ মুখে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে বিবাহ করিতে যান।

রামকৃষ্ণ একদিন মা কালীকে বলিলেন, "মা আমায় মুখ্য করলি কেন? মুখ্য যে বড় গালাগালি"। মা অমনি প্রকাশিত হইয়া কতকগুলি জঞ্জালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ বিদ্যা"। রামকৃষ্ণ বুঝিলেন, মাকে পাইলে আর সব বিদ্যা ঐ জঞ্জালের মত।

রামকৃষ্ণের স্ত্রী ভাব।

রামকৃষ্ণ বাল্যকালে অনেক সময়ে বালিকা সাজিয়া থাকিতেন—সে বেশ দেখিলে অনেকেরই বালিকা বলিয়া ভ্রম হইত।

রামকৃষ্ণের বয়স যখন দশ কি এগার বৎসর, তখন এক স্থানে বেড়াইতে গিয়া শুনিলেন, এক ভদ্রলোক গর্ব্ব করিয়া বলিতেছে, "পাড়ার সকলের বাড়ির অন্দরের কথা গ্রামের পুরুষদের কাণে উঠে, কিন্তু আমার অন্দরের কথা কেহ জানিতে পারে না"। এই কথা শুনিয়া বালক রামকৃষ্ণ তাঁতি বউ সাজিয়া সেই ভদ্রলোকের অন্দরে প্রবেশ করিলেন। বাটীর মেয়েরা তাঁতি বউএর মিষ্ট কথা শুনিয়া গলিয়াগেল। বউ ঝিয়া তাঁতি বউএর কাছে বসিয়া আপন আপন সুখ দুঃখের কথা বলিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইলে তাঁতি বউকে ভাল করিয়া

জলখাবার দেওয়া হইল। সন্ধ্যা অতীত হইলে রামকৃষ্ণের পিতা রামকৃষ্ণের অন্বেষণে বাহির হইলেন। "গদাই—গদাই" বলিয়া পিতা চীৎকার করিতেছেন;—গদাই তখন সেই বাটীর কাছে যখন পিতার আওয়াজ শুনিলেন "ও গদাই"; আর থাকিতে পারিলেন না—"কেন আমি এদের বাড়ী"! স্ত্রীলোকেরা তখন চমকিয়া উঠিল, গদাই কাপড় খুলিয়া বালক সাজিল।

যৌবনে যখন সখীভাবে সাধনা করিতেন, তখন জানবাজারে মথুর বাবুর অন্দরমহলে স্ত্রীলোক সাজিয়া বাস করিতেন। স্ত্রীলোকেরা রামকৃষ্ণকে তেল মাখাইয়া দিতেন। রামকৃষ্ণের সরল বালকভাব দেখিয়া যুবতীদিগের আদতে লজ্জাবোধ হইত না। প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় রামকৃষ্ণ স্ত্রীবেশে ঠাকুরকে বরণ করিতেন। একদিন মথুর বাবু জগদ্ধাত্রী বরণের সময় অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন। মথুর বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা! মা যাইতেছেন আমার প্রাণ কেমন করছে"। রামকৃষ্ণ অমনি মথুর বাবুর বুকের উপর হাত দিয়া বলিলেন "ভয় কি? মা তোমার বুকে আছেন"। ইহার পর হইতে মথুর বাবুর প্রত্যহ ভাবাবেশ হইতে লাগিল। মহাপুরুষ কিছুদিন পরে মথুর বাবুর সে ভাব নষ্ট করিয়া দেন।

স্ত্রীলোকেরা কি প্রকারে পুরুষদিগকে বিমোহিত করে, রামকৃষ্ণ ভাবভঙ্গির সহিত বড় সুন্দর দেখাইতেন। স্ত্রী কিরূপে স্বামীকে আহার করান একদিন সুন্দররূপে দেখাইয়াছিলেন। স্বামী আর খাইবেন না, স্ত্রী ঐ সন্দেশটা খাও; ঐ

রুলিপীখানি খাও, ঐ দইটুকু খাও ইত্যাদি বলিতে বলিতে
ধুরভাবে বুকের কাপড় টানিতে লাগিলেন, মাথার আলগা
াপড় আঁটিতে লাগিলেন। তারপর ঐভাবে স্ত্রী বলিতেছেন
কাল বামুনদের বড় বৌ একছড়া বেশ সাতনর গড়িয়েছে,
ামার ইচ্ছা হয় ঐরূপ একছড়া সাতনর গড়াই"। এই অদ্ভুত
ীভাব যে দেখিয়াছে সে কখন ভুলিবে না।

অবতার ভাব।

যখন সবই ঈশ্বর, সবই ব্রহ্ম তখন এ জগতে অবতার কে
য় ? আগুণ সকলের ভিতরে আছে এ কথা সত্য বটে কিন্তু
কলই আগুণ এ কথা বলি না। যখন একটা জিনিস জ্বলিতে
াকে তখন তাহাকে আগুণ বলি। সকলের ভিতরে ব্রহ্ম
াছেন কিন্তু যখন কোথাও ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ দেখি তখন
লি ঐ ব্রহ্ম। বিচার করিয়া দেখিলে একটা মাছ ব্রহ্ম বটে
কন্তু "সচ্চিদানন্দ" বস্তু যতক্ষণ না উহাতে প্রকাশিত দেখি
তক্ষণ উহাকে ব্রহ্ম বলি না। যেমন অঙ্গারে আগুণ ধরিলে
অঙ্গার আগুণ হয়, অঙ্গারের আর নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম গুণ কিছুই
াকে না;—সেইরূপ মৎসে যখন ব্রহ্মশক্তি—চৈতন্যশক্তি
প্রকাশিত হয়—মৎসের ভিতরে প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়
তখন সেই মৎসের আর নিজধর্ম্ম কিছুই থাকে না; তখন
ব্রহ্মের গুণ ধর্ম্ম কর্ম্ম মৎসে প্রকাশিত হয়—তখন মৎস ব্রহ্ম,

মৎস অবতার। এইরূপে কোন জিনিসে যখন তাহার সত্বার প্রকাশ হয় অর্থাৎ চৈতন্য প্রকাশ হয় তখন তাহাকে ভগবানের অবতার বলা হয়। যখন কোন মানুষে এই চিৎশক্তির প্রকাশ হয় তখন সে ভগবান।

মানুষ ভগবান হয়। ভগবানের চিন্তা, আরাধনা, করিতে করিতে মানুষের সমস্ত রিপুর বিলোপ হইলে, মানুষে প্রকৃত বস্তু যাহা তাহার প্রকাশ হয়। মানুষ সাধনাদ্বারা "অহং" নাশ করিতে পারিলে "অহং" স্থলে ব্রহ্ম বস্তুর প্রকাশ পায়। তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না—ভগবান হয়। ভগবানকে পাওয়ার অর্থই ভগবান হওয়া। মানুষের ক্ষুদ্র প্রকৃতির ভিতরে অনন্ত ব্রহ্ম লুকাইয়া আছেন—ক্ষুদ্র প্রকৃতি শুদ্ধ হইলেই অনন্ত ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। যাঁহারা অদ্বৈত ভাবের প্রার্থী—তাঁহারা অনন্তে লীন হন—ইহাঁদের ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু যাঁহারা দ্বৈতভাব বজায় রাখিতে ইচ্ছা করেন—নির্ব্বাণ মুক্তি চান না তাঁহারা ভগবানের সঙ্গে এক হইয়াও দ্বৈতভাবে থাকিতে চাহেন। ইহাঁরা দ্বৈতাদ্বৈতভাবে থাকেন। ইহাঁরা আপনাদিগকে সেই অনন্ত অস্তিত্বে লীন করেন না। ইহাঁরা ভগবানের সমস্ত শক্তিতে পূর্ণ হইয়া ভগবানই হন। ইহাঁরা এই অবস্থা লাভ করিয়া সংসারের উপকারের জন্য সময়ে সময়ে নিজ ইচ্ছায় দেহ ধারণ করেন। ইহাঁরা জন্মগ্রহণ করিয়া শঙ্কর, চৈতন্য, নানক খৃষ্ট প্রভৃতি মহাত্মাদের মত জগতে অসামান্য কীর্ত্তি সংস্থাপন করেন, মোহজড়িত জাতির উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। ইহাঁরা ভগবানের অবতার। কারণ ইহাঁদের মধ্যে ভগবান প্রকাশিত থাকিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পন্ন

করেন। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে সিদ্ধ হইয়া—জীবন্মুক্ত হইয়া—নিজ ইচ্ছায় সংসারের উপকারের জন্য জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের জন্ম ভগবানের জন্ম; তাঁহাদের কর্ম্ম ভগবানের কর্ম্ম, তাঁহাদের উপদেশ ভগবানের উপদেশ। রামকৃষ্ণ পরমহংস পূর্ব্বজন্মে স্বীয় সাধনাবলে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া "ভগবান" হইয়াছিলেন। পৃথিবীর উপকারের জন্য আবার স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা ইঁহার মত আপনি বিনা উপদেশে, বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন (অর্থাৎ যাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ;) তাঁহাদের জন্মকে ভগবানের জন্ম বলা যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংস যে বিনা উপদেশে—বিনা সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন এই সিদ্ধি তিনি কি আকাশ হইতে পাইলেন? বিনা পরিশ্রমে এ জগতে কিছুই পাওয়া যায় না; রামকৃষ্ণ অনেক পরিশ্রমে পূর্ব্বজন্মে যাহা পাইয়াছিলেন তাহা এ জন্মে আপনি বিকশিত হইল। রামকৃষ্ণ সিদ্ধ হইয়া যে সাধনা করিয়াছিলেন—সেটা লোক শিক্ষার জন্য। পূর্ব্বজন্মে সিদ্ধ—ভগবানের অবস্থাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণের জন্মকে ভগবানের জন্ম, এমন রামকৃষ্ণের উপদেশকে ভগবানের উপদেশ বলিলে ঠিককথাই বলা হয়। এইজন্য রামকৃষ্ণ পরমহংস মানুষ নহেন—ভগবান।

তাঁর এই ভাবটী অনেক ঘটনায় স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন। চৈতন্য যেমন আপনাকে আপনি ভগবান বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসও আপনাকে আপনি ভগবান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন :—

(১) পাঠকগণ এই পুস্তকে, বৈদান্তিক মহা পণ্ডিত জলধারীর কথা জানিয়াছেন? ইনিতো সাকার উপাসনাই মানেন না।

একদিন কালী মন্দিরে রামকৃষ্ণ কালীমার কাছে বসিয়া আছেন; হলধারী মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল। রামকৃষ্ণ তখন "আপনার স্বরূপ" হলধারীকে দেখাইলেন। হলধারী ভক্তিতে কাঁদিতে কাঁদিতে "ভগবানের স্তব" আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তারপর "আপনি ভগবান ভগবান" বলিয়া রামকৃষ্ণের পা ধরিতে গেলে রামকৃষ্ণ বলিলেন, "এ কথা তুমি ভুলিয়া যাইবে।" হলধারী বলিলেন "আমি কখনও ভুলিব না।" কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণের মানবমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আসল কথা ভুলিয়া গেলেন।

(২) বাবু কেশবচন্দ্র সেন তাঁর শেষ জীবনে ঠিক হিন্দু হইয়া আসিতেছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ঈশ্বরের অবতার ভাব বুঝিয়াছিলেন। একদিন রামকৃষ্ণ, কেশবের মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে কমলকুটীরে গমন করিলেন, কেশব রামকৃষ্ণকে আপনার উপাসনাগৃহে লইয়া গেলেন। রামকৃষ্ণকে পবিত্র আসনে বসাইয়া, রামকৃষ্ণের পায়ে ফুল চন্দন দিয়া ভগবান জ্ঞানে পূজা করিলেন। পূজার পর রামকৃষ্ণকে সে কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। রামকৃষ্ণ তাহাতে চুপ করিয়া থাকেন। পরি-শেষে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে বলেন "কেশব আমার পূজা করিয়া নিজের মঙ্গল করিল কিন্তু কথা গোপন করিয়া অন্যের পথে বাধা দিল।"

(৩) তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন "যেমন রাজারা সময়ে সময়ে আপন আপন রাজ্যে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করেন, এবারে আমিও সেইরূপ ছদ্মবেশে এসেছি, এবারে আমায় সকলে চিনিতে পারিবে না।

(৪) ঠাকুর যখন শেষ রোগ শয্যায় শায়িত, তখন কোন শিষ্য কাছে বসিয়া ভাবিতেছিল, যদি এখন বলেন, আমি অবতার তো বিশ্বাস হয়। তখন ঠাকুর বলিলেন "যে রাম যে কৃষ্ণ—সেই এখন রামকৃষ্ণ।"

(৫) ঠাকুর কাহাকে বলিতেন, আমাকে ভজনা কর। কাহাকে বলিতেন তোমার মন্ত্র আমাকে ফিরিয়া দাও।

(৬) এক সময়ে বলিয়াছিলেন "কিসে ঈশ্বর পাব কিসে ধর্ম্ম পাব" মনে করিয়া যে এখানে আসিবে তাহারই মনোরথ পূর্ণ হবে। এখানে এলে গেলেই হবে আর কিছু করিতে হবে না। ভক্তদের বলেছিলেন তোমাদের কোন সাধন ভজন করিতে হবে না, আমাকে ষোলআনা বিশ্বাস করিলেই হইবে।

(৭) তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকে আমার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিবে, আমার ঘরে ঘরে পূজা হবে।"

(৮) একদিন "কল্পতরু" হন এবং মা কালীরূপে পূজা গ্রহণ করেন।

(৯) প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, বর্দ্ধমানের সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন, গৌরি পণ্ডিত প্রভৃতি বিখ্যাত সাধু পুরুষেরা আসিয়া "অবতার" জ্ঞানে রামকৃষ্ণের স্তব করেন।

ভগবান রামকৃষ্ণের উপদেশ

জগতের ধর্ম্ম।



১। গ্যাসের আলোক নানাস্থানে নানাভাবে জ্বলিতেছে; কিন্তু এক আধার হইতে আসিতেছে। নানাদেশের ধর্ম্ম সেই এক পরমেশ্বর হইতে আসিতেছে।

২। কোন ধর্ম্ম অবলম্বনীয়?

হিন্দুর পক্ষে আর্য্যঋষিদের ধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্মই অবলম্বনীয়। মুসলমানের পক্ষে কোরানের ধর্ম্ম, খৃষ্টানের পক্ষে বাইবেলের ধর্ম্ম।

৩। আকাশের জল কেমন নির্ম্মল, কিন্তু ছাত জলের ধূলার সহিত মিশিয়া মলিন হয়। ধর্ম্ম নিজে অতি পরিষ্কার কিন্তু কুলোকের জীবনে গিয়া অপরিষ্কার হয়।

৪। ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁর ভাব বিভিন্ন। কোরানে এক প্রকার ভাবে প্রকাশিত, বাইবেলে আর এক প্রকার ভাবে কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মে তাঁর তেত্রিশ কোটি ভাব।

৫। ঈশ্বর লাভের জন্য স্বধর্ম্ম ছাড়িতে হয় না। যার তৃষ্ণা পায়, সে কি গঙ্গার জল ঘোলা বলিয়া পুকুর কাটিয়া জলপান করিতে যায়। তৃষ্ণা থাকিলে ওসব বিচার থাকে না।



সিদ্ধ পুরুষ।



১। দুধে জলে একত্রে রাখিলে মিশিয়া যায়, কিন্তু দুধকে মাখন করিলে আর জলের সঙ্গে মিশে না। ঈশ্বরকে পাইলে মানুষ যত কেন সংসারী পাপিষ্ঠের সঙ্গে থাকুক না কেন সে তাঁহাদের সঙ্গে কখনও মিশিয়া যাইবে না।

২। যেমন আলু বেগুন সিদ্ধ হইলে নরম হয় সেইরূপ মানুষ সিদ্ধ হইলে নরম হয়।

৩। সিদ্ধপুরুষ চারিপ্রকার; যথা —স্বপ্নসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, হঠাৎ সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। যেমন হঠাৎ কোন গরিব লোক মাটীর ভিতর কি জঙ্গলে অনেক টাকা পেয়ে বড় মানুষ হয়, সেইরূপ অনেক পাপীলোক হঠাৎ জ্ঞান রত্ন পাইয়া সিদ্ধ হয়। যেমন মেছুনির মুখে "বেলাগেল" এই কথা শুনিবা মাত্র, লালাবাবুর হঠাৎ-প্রাণে চমক লাগিল "আমার তো বেলাগেল তবে কেন এখনও বিষয়ঘোরে নিশ্চিন্ত রহিয়াছি—মৃত্যুনদী পারের যে কোন উপায় করি নাই"। এই ভাবে বিভোর হইয়া সংসার ত্যাগ করিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া সিদ্ধ হইলেন।

লাউগাছে কুমড়াগাছে আগে ফল হয় তার পর ফুল হয়; নিত্য সিদ্ধ লোক আগে সিদ্ধ হয় তার পর সাধন করে। ইহাঁরাই জগতে অবতার রূপে পূজা পান।

৪। হাট হইতে দূরে থাকিলে কেবল হাটের গোলমালই শুনা যায়। স্পষ্ট কথা কিছুই শুনা যায় না। কিন্তু হাটের

ভিতরে যাইলে স্পষ্ট কথা শুনা যায়। মানুষ যতদিন ঈশ্বর হইতে দূরে থাকে ততদিন ধর্ম্মের নানা গোলমাল শুনিতে থাকে; শাস্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা, তর্ক শুনিতে থাকে, স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে গেলে তখন সব কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারে। তখন আর ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থ লইয়া বাক বিতণ্ডা করিতে হয় না—শাস্ত্রের যা প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা ঈশ্বরের কাছে গিয়াছেন তাহারাই ধর্ম্মের প্রকৃত কথা বুঝিতেছেন—দূরের ব্যক্তিরা কিছুই বুঝিতেছে না।

৫। যে, মারিতে গেলে, হত্যাকারীর জন্য মঙ্গল কামনা করে (যেমন হরিদাস, যীশুখৃষ্ট, প্রহ্লাদ) সেই সিদ্ধ।

৬। বেঙাচির লেজ খসিলে সে জলেও থাকে ডাঙ্গাতেও থাকে। অবিদ্যারূপ লেজ খসিলে মানুষ মুক্ত সিদ্ধ হইয়া সচ্চিদানন্দেও থাকিতে পারে আবার সংসারেও থাকিতে পারে।

৭। হাঁস ঠোঁটে এক প্রকার অদ্ভুত রস থাকায় জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধ আলাদা করিতে পারে। যাঁহারা পরমহংস তাঁহারা মায়ামিশ্রিত ব্রহ্ম বস্তু হইতে ব্রহ্ম বাছিয়া লন।

৮। ফল বড় হইলে ফুল আপনি খসিয়া যায়, দেবত্ব বাড়িলে নরত্ব থাকে না। সিদ্ধ পুরুষদের নরত্ব নাই সবই দেবত্ব।

৯। মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চারিদিকে গুণ গুণ করিতেছে, জানিবে সে মধু পায় নাই। মধু পাইলে আর গুণ গুণ করে না, চুপ করিয়া মধুপান করে। মানুষ যতদিন ধর্ম্ম লইয়া গোলমাল করে ততদিন জানিবে ধর্ম্ম পায় নাই। যখন

ধর্ম্ম পাবে আর গোলমাল করিবে না, চুপ করিয়া ধর্ম্মের মধু পান করিবে।

১০। উঁচুতে উঠিলে সকলই সমান দেখায়। ঈশ্বর পেলে ভাল মন্দ সব এক হইয়া যায়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

১। যেমন স্রোতের জলে একটা লাটী বা তক্তা আড় করিয়া ধরিলে দুভাগ দেখায়, সেইরূপ অখণ্ড পরমাত্মা মায়ারূপ উপাধি দ্বারা দুভাগ দেখায়।

২। যেমন জল ও জলের বুদ্বুদ এক, বুদ্বুদ যেমন জলেই উঠে, জলেই থাকে, জলেই মেশে; সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মা একই; তফাৎ এই, বড় ও ছোট, আশ্রয় ও আশ্রিত।

অবতার।

১। বৃষ্টিতে সামান্য নালাদিয়া জল যায় মাত্র। সিদ্ধপুরুষেরা একটু সামান্য ঐশী শক্তির পরিচয় দেন। বানের জলে নালা, ডোবা, নদী সব ভাসিয়া যায়। অবতার যখন আসেন তখন সকল লোক তাঁর কৃপায় তরিয়া যায়।

২। কলের জাহাজ অনায়াসে কত লোক লইয়া নদীর জল তোলপাড় করিয়া চলিয়া যায়। অবতার কত পাপীকে বুকে করিয়া (সংসার তোলপাড় করিয়া) ভবনদী পার করেন।

৩। সমুদ্রের জল দূর হইতে কাল দেখায় কাছে গেলে নির্ম্মল দেখায়। কৃষ্ণের রূপ দূর হইতে কাল দেখায়, কাছে গিয়া দেখিলে নির্ম্মল দেখায় এবং যে দেখে সে নির্ম্মল হয়।

৪। জ্যোতির্ম্ময় বৃক্ষে থলো থলো রাম, থলো থলো কৃষ্ণ ফল আছেন, তাঁর এক একটী আসিয়া এত কাণ্ড করিয়া যান।

৫। অবতার ঈশ্বরের কর্ম্মচারী। যেমন জমীদার ও নায়েব। যেমন জমিদার জমিদারীতে গোলমাল হইলে নায়েবকে পাঠান, তেমনি ভগবান কোন দেশে ধর্ম্মের গোল-যোগ হইলে আপনার কর্ম্মচারীকে পাঠান। আবার খোদও আসিয়া থাকেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।"

গুরু।

১। যেমন কোন অজানিত স্থানে যাইতে হইলে, যে ব্যক্তি জানে এমন লোকের কথা শুনিয়া যাইতে হয়; সেইরূপ ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইলে যে জানে এমন লোকের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে হয়। এইজন্য গুরুর দরকার।

২। ব্যাকুল প্রাণে যে ডাকে তার কিছুই দরকার নাই। কিন্তু সাধারণতঃ সে প্রকার ব্যাকুলতা দেখা যায় না। এইজন্য গুরুর দরকার। গুরু এক কিন্তু উপগুরু অনেক।

৩। যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

৪। শিষ্য গুরুর কোন কাজ দেখিবে না। তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন অবিচারে তাহাই পালন করিতে হইবেক।

৫। মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কাণে।
জগৎগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে॥

৬। গুরু মিলে লাখ লাখ।
চেলা নাহি মিলে এক॥

সাধকের প্রতি উপদেশ।

—:o:—

১। তর্ক করিও না। তুমি তোমার মতের উপর যেমন নির্ভর কর, অন্যকে তার মতের উপর তেমনি নির্ভর করিতে দাও। ঈশ্বরের কৃপা হইলেই যে যার ভুল আপনি বুঝিতে পারিবে।

২। হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জ্বালিলে তৎক্ষণাৎ আলো হয়। হাজার জন্মের পাপ, কুসংস্কার তাঁর একবার কৃপা দৃষ্টিতে দূর হয়।

৩। মলয় বাতাস বহিলে সারবান বৃক্ষে চন্দন হয়; অসার বৃক্ষে কিছুই হয় না। ভগবানের কৃপা আসিলে স্যারবান মানুষের জীবন পবিত্র হয়; অসার মানুষের কিছুই হয় না।

৪। একজন সমস্ত দিন আখের খেতে জল দিয়া দেখিল, দূরে কতকগুলি গর্ত্ত দিয়া সব জল বাহির হইয়াছে; ক্ষেতে একটু জল নাই। যিনি বিষয় বাসনা, সাংসারিক মান সম্ভ্রম, সুখ সচ্ছন্দতার দিকে মন রাখিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, সারা জীবন উপাসনা করিয়া তিনি শেষে দেখিতে পারেন, ঐ সকল বাসনারূপ ছিদ্র দিয়া তাঁর সমুদয় উপাসনা বাহির হইয়া গিয়াছে। তিনি যেমন মানুষ তেমনি আছেন।

৫। যেমন পাঁথরে জল প্রবেশ করে না, সেইরূপ বদ্ধজীব ধর্ম্ম কথা শুনে না।

৬। টিয়াপাখীর গলায় কাঁটি উঠলে আর পড়ে না, ছানা বেলায় শিখালে পড়ে, বুড় হ'লে সহজে ঈশ্বরে মন যায় না, ছেলে বেলায় যায়। কচি বাঁশ সহজে নোয়ান যায়, পাকা বাঁশ নোয়াতে গেলে ভেঙ্গে যায়। ছেলেদের মন সহজে ঈশ্বরে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু বুড় বেলায় টানতে গেলে ছেড়ে পলায়।

৭। যে সকল লোক উপাসনা করিলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদিগের নিন্দা করে; তাহাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবে।

৮। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, তিনের দয়া হল।
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল॥

অর্থাৎ নিজের প্রতি নিজের দয়া না হওয়ায় নিজের বিপদ বুঝা হইল না, সুতরাং বিষয়াসক্তি গেল না—এই জন্য ধর্ম্মলাভে ব্যাঘাত পড়িল।

৯। প্রতিমাদি সাকার মূর্ত্তিতে ঈশ্বর ভাব থাকিলে ঈশ্বর লাভ হয়। আর কাট, খড়, মাটি, পাথর বোধ থাকিলে কিছুই হয় না।

১০। ভগবান ভক্ত ও ভাবমত এক জানিবে।

১১। সমুদ্রে রত্ন আছে যত্ন চাই, সংসারে ঈশ্বর আছেন সাধন চাই।

১২। ভগবানের কথায় যাঁর গায়ে রোমাঞ্চ হয় ও চক্ষে ধারা পড়ে তাঁর সেটী শেষ জন্ম জানিবে।

১৩। যেমন ভাব তেমনি লাভ। ভগবান কল্পতরু যে তাঁর কাছে যেমন চায় সে তেমনি পায়।

১৪। গুরুকে যে করে মনুষ্য জ্ঞান।
কি করিবে তার সাধন ভজন॥

১৫। মন মুখ এক করাই প্রকৃত সাধন।

১৬। একবার ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে।

১৭। যেমন আগে গোটা লেখা অভ্যাস করে ছোট হরপ শীঘ্র লেখা যায়, সেইরূপ আগে সাকারে মনে বসিলে সহজেই নিরাকারকে ধরিতে পারা যায়।

১৮। যেমন টিপ্ শিখিতে হইলে, আগে মোটা জিনিসের উপর টিপ্ করিতে হয়, তারপর সূক্ষ্ম জিনিসেও টিপ্ করা যায়। সেইরূপ সাকার মূর্ত্তিতে মন স্থির হইলে নিরাকার মূর্ত্তিতে সহজে স্থির করা যায়।

১৯। জান্‌তে অজান্‌তে বা ভ্রান্তে যে কোন ভাবে তাঁহার নাম করিলেই তাহার ফল হইবে।

২০। বাটীর ছাদের জল যেমন বাঘমুখো বা অন্যবিধ নল দিয়া পড়ে, কিন্তু সে জল তাদের নয় আকাশের, সেইরূপ সাধুভক্তের মুখের যে উপদেশ তা ভগবানের।

২১। সচ্চিদানন্দ সাগরের ধার হইতে জল খাইবে না, ডুবিয়া খাইবে। যদি সাংসারিক ভোগ বাসনা থাকে তো জলে নামিও না। ঐ সাগরের পরিমাণ করিতে যিনি গমন করিয়াছেন তিনি আর এ সংসারে ফেরেন নাই।

২২। যেমন বাদসাই আমলের টাকা এখন চলে না, সেইরূপ সত্য ত্রেতার যোগ তপস্যা এখন চলিবে না। এখন, এখনকার অবতারের মতে চলা চাই।

২৩। কলিকালে ভগবানের নাম সাধনই সার আর সব অসার। এখন "নামে" মুক্তি।

২৪। সকল বর্ণ এক একটী, কিন্তু "শ" তিনটী—শ, ষ, স। যত পার সয়ে যাও।

২৫। মুক্তি হবে কবে, আমি যাব যবে।

২৬। কাঁচে পারা মাখান থাকলে যেমন মুখ দেখা যায়, শুক্র ধারণ করিলে তেমনি ব্রহ্ম দেখা যায়।

২৭। চিনিতে বালিতে মিশে থাকলে পিঁপড়ে বালি ফেলে চিনি লয়। সৎলোকের লক্ষণ এই।

২৮। পাপ আর পারা ছাপা থাকে না।

২৯। বেদ পুরাণ শুনতে হয়, আর তন্ত্রের মতে কার্য্য করতে হয়।

৩০। অন্তর শাক্ত, বাহিরে শৈব, মুখে হরি হরি, নারদের এই ভাব ছিল।

৩১। যে বাটীতে হরিসঙ্কীর্ত্তন হয় সে বাটীতে কলি যাইতে পারে না।

৩২। যার বিশ্বাস আছে তার সব আছে। যার বিশ্বাস নাই তার কিছুই নাই।

৩৩। সাধকের দীনভাব চাই। কোন ব্যক্তি কোন সাধুর নিকট গিয়া দীনভাবে বলিলেন, "আমি অতি অধম, আমি আপনাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করি"। তাহাতে সাধু বলিলেন, "আচ্ছা তোমার চেয়ে যা খারাপ তাই নিয়ে এস"। লোকটী তখন ভাবিয়া দেখিল তাহা অপেক্ষা খারাপ এক "গু" ভিন্ন আর কি আছে? এই ভাবিয়া "গু" আনিতে গেল। "গু" বলিল খবরদার আমায় স্পর্শ করিও না। আমি দেবতার ভোগ্য ছিলাম, তোমার দেহ স্পর্শ করিয়া আমার এই দশা হইয়াছে। একবার স্পর্শে এইতো সন্দেশ ছিলাম "গু" হইয়াছি—আবার যদি স্পর্শ কর না জানি "গু"এর অধম আরো কি হইব। লোকটী গুয়ের অধম বলিয়া আপনাকে মনে করিল। এইরূপ ভাব না হইলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

৩৪। জলে ডুবে গেলে যেমন প্রাণ ধড়ফড় করে ভগবানের জন্য যখন সেইরূপ প্রাণ ধড়ফড় করিবে তখন ভগবান নিশ্চয়ই দেখা দিবেন।

৩৫। একদিন চৈতন্য নিত্যানন্দকে বলিলেন "ভাই আমি এত জীবকে প্রেম দি তবু ওদের কিছু হয় না কেন? নিত্যানন্দ

বলিলেন, "ওরা স্ত্রী সংসর্গ করে এজন্য কিছু থাকে না"। তাহাতে চৈতন্য বলিলেন "শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের গতি কোনকালে নাই"।

৩৬। সাধকের বিশ্বাসই সম্বল। রামচন্দ্রকে সেতু বেঁধে সমুদ্র পার হইতে হইয়াছিল আর হনুমান বিশ্বাসের তেজে "জয় রাম" বলিয়া সমুদ্র পার হইয়াছিলেন।

৩৭। সাধু বাক্যে সংশয় করিবে না।

৩৮। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়।

৩৯। ভগবানের সঙ্গে জীবের খুব নিকট সম্বন্ধ। যেমন লোহা ও চুম্বক। যেমন লোহাতে কাদা মাখান থাকিলে চুম্বক টানে না সেই রকম জীবে মায়া মাখান থাকিলে ভগবান টানেন না। যেই সেই মায়া যায় অমনি ভগবান টানিয়া লন।

৪০। ভগবানের কৃপা পবন সর্ব্বদা বহিতেছে। হৃদয় কুটীরের কপাট জানালা খুলিয়া না দিলে সে বায়ু সেথায় যাবে কেন? অর্থাৎ সরল প্রাণে যে তাঁকে ডাকে সেই তাঁর কৃপা পায়।

৪১। পাল্লা যে দিকে ভারি হয় সেই দিকে নামিয়া পড়ে, আর যে দিকে হালকা হয় সেই দিকে উঠিয়া যায়। যে জীবনে টাকা কড়ি মান সম্ভ্রমের ভার সে জীবন নামিয়া পড়ে, যে জীবনে ওসব নাই তাহা উঠিয়া ঈশ্বরে পঁহছে।

৪২। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না।



ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে উপদেশ।

ভগবানকে কি চোখে দেখা যায় না? তাঁহাকে কি ভোজন করান যায়? তাঁর সহিত কি কথোপকথন হইতে পারে?

কোন ভগবান পিপাসু উক্ত প্রশ্ন বিশেষ আগ্রহের সহিত করিলে রামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন:—দেখ ভগবানকে কে দেখতে চাহে? তাঁর সহিত দেখা হইল না বলিয়া কার প্রাণ আকুল হয়? তাঁহাকে দেখা যায় না, তিনি বাক্য মনের অতীত, তিনি নিরাকার, জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ ইত্যাদি কয়েকটী মাত্র গুণ তাঁহাকে দিয়া তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছ? তাঁহাকে যদি সীমাবদ্ধ করিয়া থাক তো তাঁহাকে দেখিবে কেমনে? দেখা দিবার তাঁর শক্তি যে তোমরা রাখ নাই। এত বাধাবাধীর স্বরূপে যাঁহারা ভগবানকে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁর উপাসনা করেন তাঁহারা ভগবানকে দেখিতে চান না—সুতরাং দেখিতে পান না। তাঁহাকে দেখিতে হইলে তাঁহাকে ব্যাকুলপ্রাণে ডাকিতে হইবে। যিনি অন্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী তিনি তোমার কথা শুনিবেন না? কথা শুনিয়া উত্তর দিবেন না? এ কথা তোমরা কোন সাহসে বল? তোমাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহার স্বরূপতত্বে অধিকার নাই, সেই জন্য সর্ব্বশক্তিমানের কার্য্যে অবিশ্বাস করিতেছ। দেখ বাপু! যেমন দ্রব্যের ইচ্ছা কর তদনুযায়ী সাধনা করিতে হয়? পরিশ্রম ব্যতিত কোন দ্রব্য লাভ হয় না। কলিকালে কঠোর

তপস্যা মানুষের সাধ্য নয়। কিন্তু অনুরাগ ভিন্ন ভগবানকে কখনও পাওয়া যায় না। অনুরাগভবে ভগবানকে ডাকিলে তিনি দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই অনুরাগ হয় না। যেমন ইচ্ছা করিলেই ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় না; সেইরূপ ইচ্ছা করিলেই অনুরাগ হয় না। যেমন শরীরের খাদ্যের প্রয়োজন হইলেই ক্ষুধা হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রয়োজন হইলেই ঈশ্বরানুরাগ আপনি উপস্থিত হয়। যে পর্য্যন্ত সংসারের ভোগ বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত না হইবে, যে পর্যান্ত কামিনীকাঞ্চনের যোগ এককালে বিনষ্ট না হইবে, যে পর্য্যন্ত বাপ মার তাড়নায় ক্রমাগত হতাশ না হইবে, সে পর্য্যন্ত ভগবানের জন্য কখনও প্রাণ আকুল হবে না। কয়জন ব্যক্তি ভগবান পাইলাম না বলিয়া অস্থির হইয়াছে? কালীঘাটে যাও, তারকেশ্বরে যাও, বৈদ্যনাথে যাও দেখিবে লোকে ষোড়শোপচারে পূজা দিতেছে কেন? কেহ মোকর্দ্দমায় জিতিয়াছে, কেহ উৎকট রোগ হইতে আরাম হইয়াছে, কেহ পুত্র পাইয়াছে, কেহ শত্রুপাত করিয়াছে ইত্যাদি। ভগবানের পাদপদ্ম দেখিবার জন্য একটা লোক পাইবে না। গঙ্গাতীরে গিয়া দেখ কত লোক মা গঙ্গে! চরণে স্থান দাও মা! বলিয়া কাঁদিতেছে—যেন কত ভক্তি! কিন্তু কেন যে কাঁদিতেছে? কারণ অনুসন্ধান করিলে অবাক হইবে। কেহ পুত্রহারা হইয়া পুত্রশোক নিবারণের জন্য গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরিতে প্রার্থনা করিতেছে, কেহ বিধবা হইয়া বৈধব্যানল নিবাইতে গঙ্গাজল প্রবেশের ইচ্ছা করিতেছে; কিন্তু মাকে দেখিবার জন্য কয়জন লোক গঙ্গায় যায় বল দেখি? বাস্তবিক যে তাঁকে দেখিতে চায় তার সম্মুখে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন।

একবার ভগবান বলিয়া কাঁদিয়া দেখ। একবার প্রাণনাথ বলিয়া কাঁদিয়া দেখ। তাঁহাকে ডাকিলে, কাতরপ্রাণে ডাকিলে, তিনি কখনই স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। কথা বলিতে বলিতে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণের সেই-ভাব দেখিয়া সকলেই ভগবদ্ভক্তি স্পর্শে গলিয়া গেল। তারপর একটু সুস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্বদা তাঁকে স্মরণ করিবে। ভগবানকে সর্ব্বদা মনে রাখিলে সংসারের সব বাধাবিপত্তি কাটিয়া যাইবে। ভগবানের নাম সর্ব্বদা জপ করিবে, মনে পার, করে পার, মালায় পার, যে প্রকারে পার ভগবানের নাম সর্ব্বদা ধরিয়া থাকিবে। তাঁর নামের অসীম শক্তি। নামেই সকল সাধ মিটিবে। যে যত পাপী হউক, পাষণ্ড হউক, পতিত হউক নামে নিশ্চয় উদ্ধার পাইবে। এই বলিয়া একটী ভজন গাহিতে লাগিলেন :—

হরিসে লাগি রহরে ভাই
তেরা বনত বনত বনি যাই।
(থসড় ফসড় মিট যাই
বিগড়ি বাত বনি যাই)

অঙ্কাতারে বঙ্কাতারে তারে সুজন কশাই।
সুগা পাড়ায়কে গণিকাতারে তারে মীরাবাই॥
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা বেনিয়া বয়েল চরাই।
এক বাতসে ঠাণ্ডা পড়েগা খোঁজ খবর না পাই॥
য়াসি ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই।
সেবাবন্দি আওর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই॥

তার পর বলিতে লাগিলেন, "ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতেছি যখন নামের ফলে আপনি বিবেক বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মান, অভিমান, কপটতা, বাচালতা আপনি দূর হয়। ভক্তি আপনি আইসে। এই ভক্তিই ভগবানের স্বরূপ তত্ত্বের দ্বারস্বরূপ। ভক্তি ভাব যে লাভ করিতে পারে, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার সেই প্রাপ্ত হয়"। (তত্ত্ব-মঞ্জরীর প্রথমভাগে ৪র্থ সংখ্যা—দেখ)।

স্ত্রীলোকের পতিভাব উপদেশ।



এক সময়ে কয়েকটী স্ত্রীলোক রামকৃষ্ণের নিকট গমন করিলে মহাপুরুষ কোন মহিলার প্রতি লক্ষ করিয়া আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আহা! আহা! এমন বিশ্বরূপিণী খুব কম দেখিয়াছি! ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া বিদুষী কোন মহিলা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি যাহা বলিলেন তাহা কি করিয়া স্বীকার করি"! সধবাকে আপনি লক্ষ্মীই বলুন আর যাই বলুন সব শোভা পায়? কিন্তু বিধবার আবার সুলক্ষণ কি? আপনি জানেন না, যাহাকে বলিতেছেন উনি বিধবা। আর একজন স্ত্রীলোক বলিল, "ওঁর আর দোষ কি? সধবার মত পোষাক গহনা দেখিয়া উনি বলিয়াছেন! বিধবা হইলে সোনার বালা লালপেড়ে ধুতি পরে, ইহা উনি কেমন

করিয়া জানিবেন”? মহাপুরুষ তখন খুব উৎসাহের সহিত বলিলেন, “আমি সব জানি তবুও বলিতেছি উনি সাক্ষাত বিদ্যারূপিণী। তোমরা পতিকে লইয়া যেরূপ ভাবে দিন যাপন কর এবং তাঁহার পরলোক গমনের যেরূপ পরিণাম মনে কর, বাস্তবিক পতিভাবে ভগবানের সে উদ্দেশ্য নহে। পতির সহিত কয়েকদিনের অস্থি মাংসের সম্বন্ধ নহে। এ সম্বন্ধ চিরদিনের বলিয়াই প্রভু একটী গল্প বলিলেন:—কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে সকলেই পতিপ্রাণা বলিয়া জানিত। সেইজন্য রাজাও রাণীর খুব বাধ্য ছিলেন। রাজা রাণীকে কত ভাল ভাল গহনা দেন—রাণী সব সিন্দুকে রাখেন, রুলি ভিন্ন আর কিছুই পরেন না। ইহাতে মনে মনে অনেকে ভাবিত তবে বুঝি রাণীর মনে সুখ নাই। কত সাধনা করিলে রাজার রাণী হওয়া যায়! ওমা একি প্রকার মেয়ে! স্ত্রীলোকের যা আসল সুখ গহনা পরা—তাতে আদতে মন নাই—এ নিশ্চয়ই পাগল। রাণী রাজাকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। প্রাতঃকালে উঠিয়াই রাজাকে প্রণাম করিয়া চরণধূলী মাথায় লইতেন সেই সময়ে দুচক্ষু বহিয়া জলধারা পড়িত। তারপর স্নান করিয়া রাজাকে স্নান করাইতেন। তারপর রাজার অভিরুচি অনুযায়ী পোষাক রাজাকে পরাইতেন। রাজা রাজদরবারে যাইতেন। রাণী আপনি রাজার জন্য পাক করিতেন, অপরের সংস্পর্শিত দ্রব্য স্বামীকে খাইতে দিতেন না। এইটী সতী স্ত্রীর বিশেষ লক্ষণ। যে স্ত্রী সতী সে মহারাণী হইলেও আপনি দেখিয়া আপনি রাঁধিয়া স্বামীকে আহার করান।

দাস দাসীর হাতে স্বামীর ভোজনাদির ভার দেওয়া সতীর ধর্ম্ম নহে। ভোজনান্তে যে পর্য্যন্ত না স্বামী নিদ্রিত হইতেন সে পর্য্যন্ত আপনি স্বামীর চরণ সেবা করিতেন। কখনও কোন দাস দাসীকে স্বামীর অঙ্গসেবা করিতে দিতেন না রাজা ঘুমাইলে নিজে গৃহ বন্ধ করিয়া নীরবে রাজার পাতের প্রসাদ মাত্র খাইয়া ত্বরায় আবার রাজার কাছে আসিয়া চরণসেবা করিতেন। রাণী রাজা ব্যতীত আর কোন দেবতার অর্চ্চনা করিবার অবসর পাইতেন না। একদা গুরুঠাকুর আসিয়া রাণীর দীক্ষা সম্বন্ধে রাজার নিকট প্রস্তাব করিলেন। রাজা রাণীর কাছে সে কথা বলিয়া পাঠাইলে রাণী হাসিয়া বলিলেন, আমি একাকিনী দুই পতির সেবা করিব কি প্রকারে? * আপাততঃ যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, তাহারই সম্পূর্ণ সাধনা করিতে পারিতেছি না বলিয়াই কত অপরাধিনী হইতেছি। যাহাতে মনের সাধ পূর্ণ করিয়া পতিসেবা করিতে পারি গুরুদেব যেন আমায় সেই আশীর্ব্বাদ করেন। রাজা পূর্ব্ব হইতে রাণীকে পাগলিনী বলিয়া জানিতেন; এই উত্তরে পূর্ব্ব সংস্কার বদ্ধমূল হইল। কিছুকাল পরে রাজার মৃত্যু হইল। রাজবাটী শোকশব্দে পূর্ণ হইল। রাণী কিন্তু আদতে কাঁদিলেন না। রাণী গম্ভীর ভাবে অতি শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত রাজাকে সুন্দর বেশ ভূষা দ্বারা শোভিত করিয়া শ্মশানে

---

* এই ভাবটী খুব জাঁকাল ভাবে আমার "অবলাবালা" নামক উপন্যাসে চিত্রিত করিয়াছি। স্ত্রীলোক মাত্রেরই তাহা পাঠকরা কর্ত্তব্য।

বিদায় দিলেন। রাণী স্নানাদি করিয়া হাতের রুলিগুলি ভাঙিয়া ফেলিলেন। রুলির বদলে সোনার বালা পরিলেন। রাণীর এই ব্যবহার দর্শনে সকলেই অবাক হইল। একদা কয়েকটী বৃদ্ধা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা"! আপনার এরূপ বেশ দেখিতেছি কেন? রাজা মহাশয় যত দিন জীবিত ছিলেন আপনি সোনা পরিলেন না, আমরা আপনাকে কত জেদ করিয়াছি তথাপি সোনা পরেন নাই, মহারাজ কত বলিয়াছেন তবুও সোনা পরেন নাই। এইরূপে স্ত্রীলোকেরা অনেক কথা বলিলে রাণী বলিলেন, "বাছা! আমার প্রাণের কথা শুনিতে চাও বলি। বাল্যকালে শ্রীমদ্ভাগবতে শুনিয়াছিলাম, রাধিকা আয়ানঘোষের স্ত্রী হইয়া কৃষ্ণের অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র আমার রাধিকার প্রতি বড়ই ঘৃণার উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পর্য্যন্ত আমার ঘৃণার জিনিস হইল। আমি রাতদিন ভাবিতাম মানুষের কাছে যাহা পাপ দেবতারা সে কার্য্য করেন কি প্রকারে? পরে বাবাকে এই কথাটী বলিলাম। বাবা বলিলেন, "রাধিকা হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ। তিনি জীব শিক্ষার আদর্শ। সংসারে যে কয়টী হৃদয়ের বিশেষ ভাব আছে সে ভাবগুলি ভগবানে ন্যস্ত করিতে পারিলেই জীবের ভববন্ধন মোচন হয়। দাস্য সখ্যাদি পঞ্চ ভাবের মধ্যে মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ। এই মধুর ভাবে সকল ভাবের জমাট। মধুর ভাব পতি ভাবেই বিকশিত হয়। এই পতিভাব যে রমণীতে ফুটিয়াছে—সে রমণীতে বরাবর থাকিবে। সংসারের ক্ষণস্থায়ী পতিকে ধরিয়া এই ভাব প্রস্ফুটিত হয়। তারপর জগৎপতিতে যখন সেই ভাব

যায়, তখন নারীধর্ম্ম সার্থক হয়। রাধিকা পতিভাব আয়ান ঘোষ হইতে যখন ভগবানে সমর্পন করিলেন তখন পতিভাব অনন্ত বিকাশের আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইল। পিতার মুখে এই কথা শুনিয়া আমার নূতন জ্ঞান হইল। তখন বুঝিলাম ভগবান সংসারে স্বামী মূর্ত্তিতে আসিয়া সেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া যান। আমার সেই স্বামী সংসারে ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া যতদিন ছিলেন আমিও ক্ষণভঙ্গুর রুলি পরিয়াছিলাম। এখন তিনি ভগবানে মিশিয়া অক্ষয়, অমর, অজর হইয়াছেন, আমিও অক্ষয় স্বর্ণ বলয় পরিয়াছি।

এই স্ত্রীলোকটীর সেইরূপ ভাব দেখিতেছি।

একব্যক্তি রামকৃষ্ণকে বিধবা বিবাহের কথা জিজ্ঞাসিলে বলিয়াছিলেন স্ত্রীলোকের যে দিন স্বামী মরে সেইদিন হইতে তার সধবা অবস্থা অক্ষয় ভাবে আরম্ভ হয় জানিবে। বিধবা কেহ হয় না, সুতরাং বিধবার আবার বিবাহ কি? তাহাতেও ঐ গল্পটী বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন অধর্ম্মের অভিধানে "বিধবা বিবাহ" আছে কিন্তু ধর্ম্মের অভিধানে "বিধবা বিবাহ" নাই।

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মোক্ষমূলর।

—:o:—

রামকৃষ্ণের সাধুতা, রামকৃষ্ণের গভীর জ্ঞান ইউরোপ ও আমেরিকায় আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। পৃথিবীর অদ্বিতীয় পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলর ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান পত্রিকায় রামকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা বিশেষ গৌরবের কথা বলিতে হইবে। ইংরাজীওয়ালাদের তৃপ্তির জন্য মোক্ষমূলরের প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্‌ধৃতি করিলাম:—

"The late Ramkrishna Paramahansa, was a far more interesting specimen of a Sannyasim. He seems to have been, not only a high souled man, a real Mahatma, but a man of original thought. Indian Literature is full of wise saws and sayings, and by merely quoting them a man may easily gain a reputation for pro found wisdom. But it was not so with Ramkrishna. He seems to have deeply meditated on the world from his solitary retreat. Whether he was a man of extensiive reading is defficult to say, but he was certainly thoroughly imbued with the spirit of the Vedanta philosophy. His utterances, which have been published, breathe the spirit of that philosophy ; in fact are only

intelligible as products of a Vedantic Soil. And yet it is very curious to see how European thought, nay a certain European style, quite different from that of native thinkers, has found an entrance into the oracular sayings of this Indian saint. It is difficult to say whether the Vedanta is a philosophy or a religion. It seems to be both, according to the disposition of its followers or believers.

ইহার পর শঙ্কর ও রামানুজের বেদান্ত দর্শনের পার্থক্য বুঝাইয়া বলিতেছেন :——

This is a short outline of the back ground from which such men as Ramkrishna and other honest sanyasins step out, calling upon the world to have their eyes opened and to discover the way to their true salvation. This is what they preach as Brahama-knowledge or self know-ledge.

PRECEPTS OF

RAMKRISHNA PARAMHANSA.



(1)

Like unto a miser, that longeth after gold, let thy heart pant after Him.

(2)

How to get rid of the lower self? The blossom vanishes of itself as the fruit grows, so will your lower self vanish as the Divine grows in you.

(3)

There is always a shadow under the lamp while its light illumines the surrounding objects. So the men in the immediate proximity of a prophet do not understand him, while those who lie far off are charmed by his spirit and extraordinary power.

(5)

Solong as the bee is outside the petals of the flower, it buzzes, and emits sounds. But when it is inside the flower, the sweetness there of

has silenced and over powered the bee. Forgetful of sound and of itself, it drinks the nectar in quiet. Men of learning, you too are making a noise in the world, but know the moment you get the slightest enjoyment of the sweetness of Bhakti (love of god) you will be like the bee in the flower inebriated with the nectar of divine love.

(6)

The soiled mirror never reflects the rays of the Sun, so the impure and the unclean in heart that are subject to Maya (illusion) never perceive the glory of Bhagavan, the Holy one. But the pure in heart see the Lord as the clear mirror reflects the sun. so be holy.

(7)

As the light of a lamp dispels in a moment the darkness that has reigned for a hundred years in a room, so a single ray of divine light from the throne of mercy illumines our heart and frees it from the darkness of life-long sins.

(9)

A recently married young woman remains deeply absorbed in the performance of domestic duties, so long as no child is born to her. But

no sooner is a son born to her, than she begins to neglect household details, and does not find much pleasure in them. Instead thereof she fondles the new-born baby all the livelong day and kisses it with intense joy. Thus man in his state of ignorance is ever busy in the performance of all sorts of works, but as soon as he sees in his heart the Almighty God he finds no pleasure in them, On the contrary his happiness consits now only in serving God and doing His works. He no longer finds happiness in any other occupation, and can not withdraw himself from the ecstasy of the Holy Communion.

(11)

As one can ascend the top of a house by means of a ladder or a bamboo, or a stair-case or a rope, so divers are the ways and means to approach God and every religion in the world shows one of these ways.

(20)

If you can detect and find out the universal illusion or maya, it will fly away from you, just as a thief runs away when found out.

(21)

Should we pray aloud unto God? Pray unto Him in any way you like. He is sure to hear you, for he can hear even the footfall of an ant.

(23)

High up in the pure regions under the azure sky the vulture keep soaring on, but have their eyes always directed to the carrion in the field beneath. So worldly men of Learning exhibit to all around them their high attainments by clever expositions of sublime spiritual truths and by the utterance of noble sentiments becoming a sage, but their minds are all along secretly and inwardly turned to the attainment of the nearest objects of the earth to the glamour of shining gold and the vain applause of worldly men.

(24)

A little boy wearing the mask of the lion's head looks indeed very terrible. He goes where his little sister is at play, and yells out hideously, which at once shocks and terrifies his sister, making her cry out in the highest pitch of her voice in the agony of despair to escape from the

clutch of the terrible being. But when her little tormentor puts off the mask the frightened girl at once recognises her loving brother, and flies up to him exclaiming, "oh! It is my dear brother after all." Even such is the case of all the men of the world who are deluded and frightened and led to do all sorts of things by the nameless power of maya or nescience under the mask of which Brahman hides himself but when the veil of maya is taken off from Brahman the man then do not see in him a terrible and uncompromising master, but their own beloved other self.

"Protab Chandra Mozoomdar, the leader of the Brahmasomaj and well known to many people in England, tells me of the extraordinary influence which the mahatman exercised on Keshub Chandra Sen, on himself, and on a large number of highly educated men in Calcutta. A score of young men who were more closely attached to him have become ascetics after his death. They follow his teaching, by giving up the enjoyment of wealth aud carnal pleasure, living together in a neighbouring Matha (College)

and retiring at times to mountains. Besides these holy men we are told that a great number of men with their families are ardently devoted to his cause. But what is most interesting is the fact that it was the Mahatman who exercised the greatest influence on Keshub Chandra Sen during the last phase of his career. It was a surprise to many of Keshub Chandra's friends and admirers to observe the sudden change of the sober reformer into the mystic and ecstatic saint, that took place towards the end of his life. But although this later development of the New dispensation, and more particularly the doctrine of the mother-hood of God, may have alienated many of Keshub chander Sen's European friends it seems to have considerably increased his popularity with Hindu Society. At all events we are now enabled to understand the hidden influences which caused so sudden a change and produced so marked a deviation in the career of the famous founder of the Brahma-Somaj, which has sometimes been ascribed to the break-down of an over excited brain.

"It is different with a man like Ramkrishna. He never moved in the world, or was a man of the world, even in sense in which Keshub Chandra Sen was. He seems from the very first to have practised that very severe kind of asceticism (যোগ) which is intended to produce trances (সমাধি) and ecstatic utterances. We can not quite understand them, but in the case of our mahatman we can not doubt their reality, and can only stand by and wonder, particularly when so much that seems to us the out come of a broken frame of body and an overwrought state of mind, contains nevertheless so much that is true and wise and beautiful.

"What Ram Krishna seems to have meant when he represented Siva, krishna, and other Gods as helping to reveal the eternal and formless Being could only have been the Vedantic doctrine, as explained by Ramanuja, namely that these Gods and even the Lord himself when conceived as creator and Ruler of the world (the Isbara) are only so many forms or persons behind which the true being (Brahman) must be discovered; that they are not real in the highest sense

of reality, but that nevertheless their phenomenal character derives some reality from their being the transitory manifestations of the only true being the Brahman without a second. "Brahman alone is true all else is false". Krishna a god according to our ideas, of very doubtful anti. cedents, became to him the incarnation of Bhakti or loving devotion, and we are told that while meditating on him, his heart full of the burning love of God, the features of the Mahatman would suddenly grow stiff and motionless, his eyes lose their sight, and while completely unconscious himself, tears would run down his rigid, pale, yet smiling face. His disciple says: "Who will fathom the depth of that insensibility which the love of God produces? But that he sees some thing hears and enjoys, when he is dead to the out ward world, there is no doubt, or why should he in the midst of that unconsciousness burst into flood of tears, and break out into prayers, song and utterances, the force and pathos of which pierce through the hardest heart, and bring tears to eyes that never wept before through the influence of religion'. ?

"I have given this description as I find it, I know I can trust the writer, who is a friend of mine and has lived long enough in England and in India to be able to distinguish between the language of honest religious enthusiasm and the empty talk of professional impostors. The state of religious exaltaton as here described has been witnessed again and again by serious observers of exceptional psychic states. It is in its essence some thing like our talking in sleep, only that with a mind saturated with religious thoughts and with the sublimest ideas of goodness and purity, the result is what we find in the case of Ramkrieshna no mere senseless hypnotic jabbering, but a spontaneous outburst of profound wisdom clothed in beatiful poetical language. His mind seems like a Kaleidoscope of pearls, diamonds, and sapphires shaken together at random, but always producing precious thoughts in regular, beautiful outlines."

"But what was the most extraordinary of all, his religion was not confined to the worship of Hindu deities and the purification of Hindu customs. For long days he subjected himself to

ious kinds of discipline to realise the Mohım-
dan idea of an allpowerful Alla. He let his
ırd grow, he fed himself on Moslem diet, he
ıtinually repeated sentences from the Koran.
r Christ his reverence was deep and genuine.
: bowed his head at the name of Jesus, honoured
: doctrine of his sonship and once or twice
ended christian places of worship. He
:lared that each form of worship was to him
iving and most enthusiastic principle of person-
religion ; he showed, in fact, how it was possible
unify all the religions of the world by seeing
ly what is good in every one of them, and
owing sincere reverence to every one who has
ffered for the truth, for their faith in god and
r their love of men."

F. MAXMULLER

(The Nineteenth century No 234,
August 1896.)

শেষ অভিনয়।

—:০:—

১৮৮৬ সালের ১লা ভাদ্র প্রাতঃকালে রামকৃষ্ণ পরমহংস স্থূল দেহ ত্যাগ করেন। গলায় ঘা হয়—তাহাতে গলায় ছিদ্র হয়। ঘার উপলক্ষে জ্বর হয়। শিষ্যদিগকে দেহত্যাগের কথা পূর্ব্বেই বলেন। পঞ্জিকায় শুভদিন দেখিয়া ভীষণ রোগের যাতনার মধ্যে মহাসুখের সমাধিতে নিমগ্ন হন। মহা সমারোহের সহিত কাশীপুর হইতে রতনবাবুর ঘাটে শব দাহ করা হয়। পরিশেষে তাম্রপাত্রে ভস্মাবশেষ লইয়া কাঁকুড়গাছির উদ্যানে সমাহিত করা হইয়াছে। প্রতিবৎসর মৃত্যুদিন উপলক্ষে এখানে উৎসব হয়—পাষাণভেদী সঙ্কীর্ত্তনাদির সহিত শোক প্রকাশ করা হয়।

রামকৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সমস্ত দেশে ভীষণ শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল। সে মৃত্যাশৌচের ক্রন্দন কোলাহল চিরকালই থাকিবে। খৃষ্ট, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদের যে পুস্তার আসন রামকৃষ্ণেরও সেই পুস্তার আসন—রামকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলের গলা ধরিয়া প্রেমালিঙ্গনে উন্মত্ত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। বাঙ্গালাদেশ শ্রীচৈতন্যের পর তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। জননী বঙ্গভূমি! তোমার সন্তানদের মধ্যে দুই ব্যক্তি চরিত্রের যে বল দেখাইয়াছেন, ঈশ্বরের যে মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা আর অনেক কাল দেখিতে পাইব না।

একদিন ভাগিরথীতটে শ্রীনবদ্বীপে যে ভগবৎলীলার অভিনয় হইয়াছিল ; সাড়ে চারশত বৎসর পরে দক্ষিণ সহরে রাণী রাসমণীর কালী বাড়িতে সেই অভিনয় পুনরায় দেখিয়া ভক্তগণ পরিতৃপ্ত হইলেন। বাঙ্গালা দেশে শ্রীশ্রীচৈতন্যের পরই মহাভক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। বাঙ্গালা দেশ ধন্য। অবিশ্বাসীর কাছে রামকৃষ্ণ নাই। বিশ্বাসীর কাছে আছেন ও চিরকাল থাকিবেন। স্থূলদেহে নাই বটে কিন্তু সূক্ষ্মদেহে সবই করিতেছেন। দেহত্যাগ করিয়া অনেককে কৃপা করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায়"।
ভাগ্যবানে মাঝে মাঝে দেখিবারে পায়॥

—

—০:(সমাপ্ত):০—